গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ ভোলা

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
আফসানা ইয়াসমীন

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
ভোলা

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ী : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : ভোলা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএম প্রকল্প একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হচ্ছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং আফসানা ইয়াসমীন যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া ভোলা জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে ভোলা জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর ও বাংলাপিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে ভোলার উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১। আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন, ২০০৩। বরিশাল বিভাগের ইতিহাস। বরিশাল-ঢাকা, জুলাই ২০০৩

২। বি.বি.এস., ১৯৯৯। কৃষি শুমারি ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ ভোলা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুলাই ১৯৯৯।

৩। হোসেন, আবুল, ১৯৯৯। ভোলা জেলার ইতিহাস। ভোলা, ১৯৯৯।

৪। PDO-ICZMP, 2001.Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char Lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh. Dhaka, August 2001.

৫। Kranty, M., 1999. Coastal Erosion on the Island of Bhola, Bangladesh, Sweden, 1999.

৬। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh : Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৭। Rashid, M., H., 1980. Bangladesh District Gazetteers Bakerganj, Establishment, Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1980.

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৫**
এক নজরে ভোলা ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-১৬**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
খনিজ সম্পদ ১২
কৃষি সম্পদ ১২
দুর্যোগ ১৪
বিপদাপন্নতা ১৬

জীবন ও জীবিকা **১৭-২০**
জনসংখ্যা ১৭
জনস্বাস্থ্য ১৭
শিক্ষা ১৮
অভিবাসন ১৯
সামাজিক উন্নয়ন ১৯
প্রধান জীবিকা দল ১৯
অর্থনৈতিক অবস্থা ২০
দারিদ্র্য ২০

নারীদের অবস্থান **২১-২২**

অবকাঠামো **২৩-২৭**
রাস্তাঘাট ২৩
নৌ-পথ ২৩
পোল্ডার ২৩
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২৪
হাট-বাজার ও বন্দর ২৪
বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ২৪
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২৫
সেচ ও গুদাম সুবিধা ২৫
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২৬
উন্নয়ন প্রকল্প ২৬

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৯-৩৩**
প্রতিবেশগত সমস্যা ২৯
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ৩০
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা ৩২

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৩৫-৩৮**
কৃষি ও অর্থনীতি ৩৫
প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৬
যোগাযোগ ৩৬
পর্যটন শিল্প ৩৭

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩৯**

দর্শনীয় স্থান **৪১-৪২**
দ্বীপাঞ্চল ৪১
ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ৪১

জেলা মানচিত্র

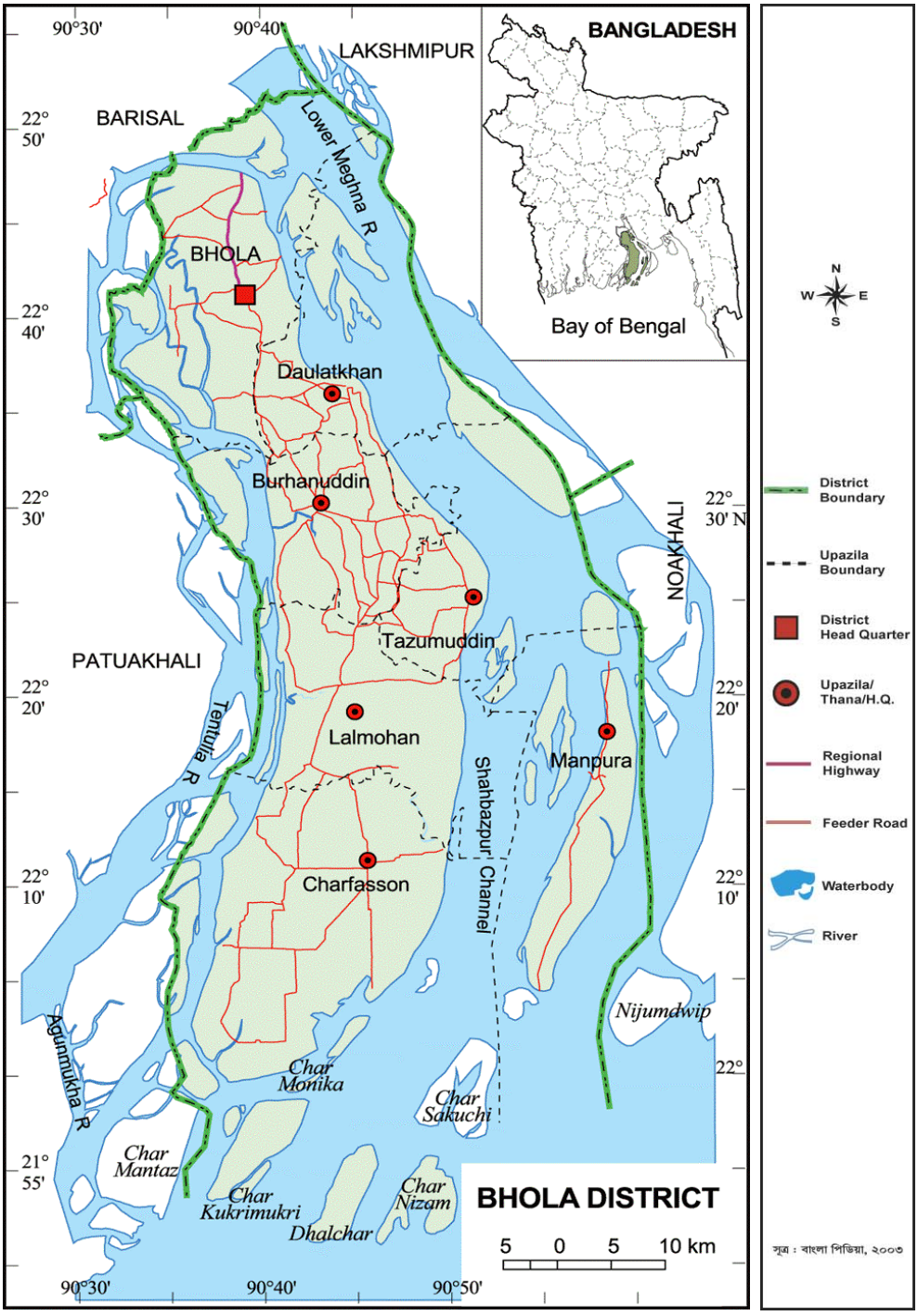
BANGLADESH
Bay of Bengal
LAKSHMIPUR
BARISAL
PATUAKHALI
NOAKHALI
BHOLA
Daulatkhan
Burhanuddin
Tazumuddin
Lalmohan
Charfasson
Manpura
Nijumdwip
Lower Meghna R
Tentulia R
Agunmukha R
Shahbazpur Channel
Char Monika
Char Sakuchi
Char Mantaz
Char Kukrimukri
Char Nizam
Dhalchar
BHOLA DISTRICT
5 0 5 10 km
90°30'
90°40'
90°50'
22° 50'
22° 40'
22° 30'
22° 20'
22° 10'
21° 55'
22° 30' N
N
W
E
S
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/ Thana/H.Q.
Regional Highway
Feeder Road
Waterbody
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপজেলা ভোলা বঙ্গোপসাগরের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। ভোলার পূর্বে পটুয়াখালী ও শাহ্বাজপুর খাল, উত্তরে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও মেঘনা, পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদী। বাংলার তিনটি প্রধান নদ-নদী পদ্মা, মেঘনা আর ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা বিধৌত এই ভোলা দ্বীপ।

একসময় পূর্ব দিকে মেঘনা আর পশ্চিমে তেঁতুলিয়া সমান্তরালে প্রবল বেগে উত্তর থেকে দক্ষিণে সাগরের দিকে ছুটে যেত এবং এদের মধ্যে ২০/২২ মাইল বিস্তৃত এলাকা ইলিশা নদী দ্বারা যুক্ত ছিল। এর মাঝে নদীর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তাই, অন্য যে কোন স্থানে ভাঙন সৃষ্টি হলে, সেই মাটি বা পলি গতিহীন স্থানে জমা হতো। এভাবে এক সময় মাটি, গাছপালা, আবর্জনা, কচুরিপানা আর লতাপাতা জমে নতুন ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং এই ভূ-খণ্ডই আজকের ভোলা জেলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরী যে, ভোলা জেলার ছোট ছোট খাল-বিল, নদী-নালার মাঝের ভাঁজগুলো এরই নিদর্শন বহন করে। জেলার দিগন্তে কোন পাহাড়-পর্বত বা গভীর বনাঞ্চল নেই। দক্ষিণে জেলার নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা না থাকায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমারেখাই ভোলার দক্ষিণের সীমানা। সাগরে জমি বা চর জেগে ভোলার আয়তন বাড়ছে। উত্তাল ও প্রমত্তা মেঘনা, তেঁতুলিয়া আর ইলিশার মুখে জেলার অন্যতম প্রধান কয়টি দ্বীপ যেমন চর জহির উদ্দীন, চর পাতালিয়া, ঢাল চর, চর কুকড়ি মুকড়ি অবস্থিত।

ভোলা জেলার আদি নাম দক্ষিণ শাহ্বাজপুর। এই অঞ্চল একসময় সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় সম্রাট আকবরের সাবেক সেনাপতি শাহ্বাজ খান মগ পর্তুগীজদের দমন করার জন্য দৌলতখানে দুর্গ স্থাপন করে যুদ্ধ করেন। সুবেদারী আমলে তার নামে এই জায়গাটির নামকরণ করা হয় শাহ্বাজপুর। ১৮৪৫ সালে নোয়াখালী জেলার অধীনে ভোলা মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় । যার কেন্দ্র ছিল দৌলতখানের আমানিয়া। পরবর্তীতে ১৮৬৯ সালে ভোলা মহকুমা বরিশাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ১৮৭৬ সালে ভোলা মহকুমার সদর দফতরটি দৌলতখান থেকে ভোলায় স্থানান্তরিত হয়। ভোলা পৌরসভা ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এটি জেলায় উন্নীত হয়। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালের ভয়াবহ সাইক্লোনের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে তৎকালীন উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা মি: আর. সি. দত্ত ভোলা শহরকে উপ-বিভাগীয় সদর দফতর হিসেবে নির্বাচন করেন।

ভোলা জেলার মোট আয়তন ৩,৪০৩ বর্গ কি.মি., যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ২.৩%। এলাকার বিচারে ভোলা জেলা উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ৬ষ্ঠ স্থানে এবং বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৬তম স্থানে রয়েছে। ২০০১ সালের লোকগণনা অনুসারে এই জেলার জনসংখ্যা ১৭ লাখ ৩ হাজার।

উপজেলা	**৭**
পৌরসভা	**৫**
ইউনিয়ন	**৬০**
ওয়ার্ড	**৪৫**
মৌজা/মহল্লা	**৪৯০**
গ্রাম	**৪৭৩**

৭টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা, ৬০টি ইউনিয়ন, ৪৫টি ওয়ার্ড, ৪৯০টি মৌজা/মহল্লা ও ৪৭৩টি গ্রাম নিয়ে ভোলা জেলা। ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দীন, তজুমদ্দীন, মনপুরা, লালমোহন আর চরফ্যাশন জেলার ৭টি উপজেলা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে ভোলার ৭টি উপজেলাকেই তীরবর্তী (Exposed Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক নজরে ভোলা

	বিষয়	একক	ভোলা	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৪০৩	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৭	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৬০	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৫	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৪৫	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৯০	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৪৭৩	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৭.০৩	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৮.৮৪	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৮.১৮	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৫০০	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৮.১	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.২	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৩.২৮	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১.৮	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩২	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১১	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৮	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৩৭	০.৭১	০.৬৯	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১২২	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	২,৮৭৫	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৬,০৯০	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৭৬১	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৫	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪৭	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১৪	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৮	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২৩	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৬	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৩৭	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৩৯	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৩৪	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৩৯	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৪৩	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৩৫	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১৭৩	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯০	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৯	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	৬,১৯৮	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬০	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯০	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	১৪	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	১১	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	১৭	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৪৭	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে জেলার অবস্থান (বি.বি.এস., ক্রমানুসারে) ২২তম স্থানে।
- জেলার দারিদ্র্য-পীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪% ও ২৩%, যা জাতীয় (৪৯% ও ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২% ও ২৪%) তুলনায় কম।
- জেলার মোট গৃহের ৯১% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় হারের প্রায় সমান ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৪৭%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি।
- তেল ও গ্যাসক্ষেত্র আছে।
- পর্যটনের দিক থেকে মোটামুটি আকর্ষনীয়।
- লিঙ্গীয় অসমতা কম।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা ১৫%, জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- ভোলা জেলার মাথাপিছু আয় ১৬,০৯০ টাকা জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.২%, জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৩%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ১১%, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা ৫৫%, যা জাতীয় (৫৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় বেশি।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৫২%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় কম।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৩৭ কি.মি./ বর্গ কি.মি.), যা জাতীয় (০.৭২% কি. মি./বর্গ কি.মি. ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি.মি./বর্গ কি.মি.) চেয়ে অনেক কম ।
- জেলার মোট আয়তনের ১০০% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০ জন, যা জাতীয় (৪৩ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫১-৬৮ জন)।
- সাক্ষরতার হার (৭+ বছর) মাত্র ৩৭%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) অনেক নিচে।
- জেলার মাত্র ২৭% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪৬%) তুলনায় অনেক কম।
- সরকারি হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ৬,১৯৮ জন, শয্যাপ্রতি যা জাতীয় (৪,২৭৬ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭ জন)-র তুলনায় অনেক বেশি।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম।
- জেলার গড়ে প্রতি ১২২ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল।
- জেলায় কোন স্থল, নদী ও বিমানবন্দর নেই।
- জেলায় রেল সংযোগ নেই।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	ভোলা	উপজেলা			
				ভোলা সদর	দৌলতখান	বোরহানউদ্দীন	তজুমদ্দীন
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৪০৩	৪১৩	৩১৭	২৮৫	৫১৩
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১০৫	২২	১৮	১৮	৫
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৯০	১২৭	৫৯	৭২	৬২
	গ্রাম	সংখ্যা	৪৭৩	১২৬	২৯	৫৮	৮৩
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৭.০৩	৪.০৯	১.৭২	২.৪৫	১.২৭
	পুরুষ	লাখ	৮.৮৪	২.১০	.৯১	১.২৬	.৬৭
	নারী	লাখ	৮.১৮	১.৯৮	.৮১	১.১৯	.৫৯
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৫০০	৯৯১	৫৪৫	৮৬৪	২৪৮
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৮	১০৬	১১৩	১০৬	১১৪
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৩.২৮	.৪৭	.৩১	.৪৭	.২৩
	গৃহস্থালির আকার	গৃহপ্রতি জনসংখ্যা	৫.২	৫.১	৫.৪	৫.২	৫.৩
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	১.৮	২.২	২.২	১.৮	১.৩
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়াল সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৩৬	৩৬	২৬	২৩
	টেকসই ছাদ সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩২	৪৩	৪৬	৩৪	২৮
	বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২.৯	৭.৯	২.২	২.২	১.১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,২৮৮	২৬৮	১২২	২১২	১৪৪
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২০১	৫০	১৭	৩০	১১
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২১	৮	১	২	১
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৪৭	৪৬	৩৩	৫১	৪২
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৬৬	৬৫	৫৫	৭১	৬৮
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৩৪	৩৫	৪৫	২৯	৩২
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১,১৮,৭০০	২০,৬২৪	৮,৭৫৬	১৭,০০২	৯,২০৯
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৯	৩৯	৬৮	১১	৩৮
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫২	৪৩	২৬	৫১	৩৭
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২৯	১৮	১৬	৩৮	২৫
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৭,৫০০	৫,০০০	৩,০০০	৪,০০০	২,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৩৭	৪১	৩৭	৩৬	২৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৬	৯১	১০০	১১৮	১০১
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	১০১	১০১	১২০	৯৯
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	৯,৮৩২	২,৮২২	১,০৩০	১,৫৫২	৬৯৪
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৮১	৮৪	৯৩	৮৮	৭৭
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৭.০০	১৫.৮৭	৭.৬৯	৪.৪৪	৪.৪৪

উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
মনপুরা	লালমোহন	চরফ্যাশন	
৩৭৩	৩৯৬	১,১০৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৩	১৮	২১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২১	৭১	৭৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২৯	৭৬	৭২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
.৬৩	২.৬৮	৪.১৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
.৩৪	১.৪০	২.১৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
.২৯	১.২৮	২.০১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৭০	৬৭৭	৩৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১১৭	১০৯	১০৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
.১২	.৫২	.৮১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.০	৫.১	৫.১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৩.২	১.৬	১.৯	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১৬	২২	২০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১৯	২৬	২২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১.৩	০.৪৪	১.৩	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৪৪	২৩৮	২৬০	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৮	৩৬	৪৯	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
১	৩	৫	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৫১	৪০	৪৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৫৭	৭২	৩৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৪৩	২৮	৬৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৬,৪৬৭	১৯,৪৬০	৩৭,১৭৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৩	-	২৭	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২৫	-	৫৭	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২	-	১৬	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২,৫০০	১০,০০০	৬,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৩৫	৩৩	৩৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৮৫	১০	৮২	২০০১(প্রা.শি.অ)
৯১	৯৭	৮৪	২০০১(প্রা.শি.অ)
৩৬৭	১,৫১০	১,৮৫৭	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৮৫	৭৮	৭১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৩.৬৩	২.৮৮	৩.৮০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

ধান-নদী-গোলা এই তিনে ভোলা। ভোলার প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এই ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলে। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ, দ্বীপাঞ্চল এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ - এ সবই ভোলা জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, জেলার কৃষি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কেননা, এখানকার কৃষির ধরন গড়ে উঠেছে ভূমি বৈচিত্র্য ও পানি-মাটির লবণাক্ততাকে কেন্দ্র করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

দ্বীপাঞ্চল : ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপ ভোলা জেলার চারদিকে ছড়িয়ে আছে যা এই জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভোলা, চর আইচ্ছা, চর চাকরিমারা, চর ঢাল, চর কুকরি মুকড়ি, চর মোতাহার, চর নিজাম, চর পাতিলা, চর তুফানিয়া, চর উড়িল, চর জহিরউদ্দীন, চর মনপুরা, চর রামদাসপুর, সোনার চর ইত্যাদি ভোলার ছোট বড় প্রধান কয়টি দ্বীপ। এই দ্বীপাঞ্চলের মোট আয়তন ২,০৫১.১৫ বর্গ কি.মি.।

মেঘনা মোহনায় অবস্থিত ভোলা জেলার দ্বীপাঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ দেয়া হয়েছে। তবে জেলার সব কয়টি দ্বীপে প্রতিরক্ষা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দ্বীপের নদী ও বাঁধের মধ্যে দূরত্ব ৫০-১০০ মিটার। অবস্থান, প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ, অবকাঠামো, জীবন ও জীবিকার দিক থেকে প্রতিটি দ্বীপই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। পুরনো ও নতুন জেগে ওঠা এ সব দ্বীপের নিজস্ব প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও পর্যটন আকর্ষণ আছে।

মোট আয়তন	২,০৫১ বর্গ কি.মি.
সংরক্ষিত দ্বীপাঞ্চল	ভোলা, চর মোতাহার, চর উড়িল, চর মনপুরা, চর হাজিরহাট, চর শুকচিয়া
অসংরক্ষিত দ্বীপাঞ্চল	চর আইছা, চর চাকরিমারা, চর ঢাল, চর কুকড়ি মুকড়ি, চর পাটালিয়া, চর তুফানিয়া, চর জহিরুদ্দীন, চর রামদাসপুর, সোনার চর
সবচেয়ে বড় দ্বীপ	ভোলা
সবচেয়ে ছোট দ্বীপ	চর নিজাম

ভোলা : ১৮৪৫ সালে জনৈক ভোলাগাজী নামের একজন মাঝির নামানুসারে এই দ্বীপটির নামকরণ করা হয়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এটি উপকূলীয় বাঁধ, পোল্ডার এবং পাকা রাস্তার মাধ্যমে সংরক্ষিত একটি দ্বীপ। একযোগে উপকূলীয় বনাঞ্চল, চর এলাকার খাস জমি, গো-চারণ ভূমি, উন্মুক্ত জলাশয়, কৃষি জমি আর বসতি জমি উপস্থিতিতে অপার সম্ভাবনাময়। দ্বীপের মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এর পরেই রয়েছে মাছ ধরা। দ্বীপটির উল্লেখযোগ্য দিক হল উপকূলীয় বাঁধ ১০০ কি.মি. এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনায়ন। নদী ভাঙন এর অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভাঙন-কবলিত মানুষেরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় অভিবাসন করে ব্যাপক হারে।

আয়তন	১,৪৪,০৬২ হে.
প্রাকৃতিক সম্পদ	উন্মুক্ত জলাশয়, খাস জমি, গো-চারণ ভূমি, উপকূলীয় বনাঞ্চল, কৃষি ও বসত জমি
দুর্যোগ	নদী ভাঙন
প্রধান পেশা	কৃষি কাজ ও মাছ ধরা

চর মনপুরা : ভোলা জেলার একেবারে পূর্ব প্রান্তের দ্বীপ চর মনপুরা মূল ভূ-খন্ড থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৩৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেও এই দ্বীপটির অস্তিত্ব ছিল এবং সে সময় এটি আংশিকভাবে সুন্দরবন বনাঞ্চলের একটি দ্বীপ হিসেবে বিবেচিত হতো। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে এই দ্বীপ বাকলা চন্দ্রদ্বীপ জমিদারী প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে কয়জন ইউরোপীয় পরিব্রাজক ডারথেমা লি ব্র্যাংক, সিজার ফ্রেডরিক ও মউনরিক এই

দ্বীপে ভ্রমণে আসেন। এই ভ্রমণকালেই মি. মউনরিক তৎকালীন দক্ষিণ শাহবাজপুর ও চর মনপুরাকে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৫১৭ সালে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চর মনপুরাকে নির্বাচন করে এবং বসতি স্থাপন করে। সেই সময় দ্বীপটির অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী-জলাশয়ের মাছ, পশুসম্পদ, মহিষের দুধ, দই, পনির যে কোন আগন্তুকের মন ভরিয়ে দিত বলে এই চরের নামকরণ করা হয় চর মনপুরা। তবে, এই দ্বীপটির নামকরণের ইতিহাস আলোচনায় ঐতিহাসিক বেভারীজ-এর সূত্র থেকে জানা যায়, স্থানীয় ঐতিহ্য মতে জনৈক মনগাজী নামের ব্যক্তি সেই সময়ের জমিদারী থেকে মনপুরা চর লীজ নেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং সেখানে তিনি কৃষিকাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার নামানুসারে এই দ্বীপটির নামকরণ করা হয় চর মনপুরা। এই দ্বীপটি একসময় সন্দ্বীপের সাথে যুক্ত ছিল এবং মোগল শাসন আমলে এখানে সন্দ্বীপের লোকেরা বসতি স্থাপন শুরু করে। লোককাহিনী মতে, মনগাজী নামের একজন মাঝি বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারালে এর নাম হয়ে যায় চর মনপুরা।

চর মনপুরা	
আয়তন	৩৭,৩১৯ হেঃ
প্রাকৃতিক সম্পদ	উন্মুক্ত জলাশয়, মাছ চাষের পুকুর, পশুসম্পদ, ম্যানগ্রোভ
দুর্যোগ	নদী ভাঙন, বসত জমির অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।
প্রধান পেশা	কৃষি ও ব্যবসা

এই দ্বীপের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং প্রধান শস্য ধান। এখানে ১৮১২ সালে প্রথম লবণ প্রস্তুত করা শুরু হয়। ১৮১৮ সালে তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা ৩৫০টি লবণ চাষী পরিবারকে দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করে, যা মানব বিপর্যয় হিসেবে বিবেচিত। আবার ১৮৭৬ সালে ভয়াবহ সাইক্লোন জেলার মানব, প্রাকৃতিক ও পশুসম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ সবই মূলত চর মনপুরার দুর্ভোগ-দুর্দশার স্মৃতি। লোকজ সূত্র মতে, এই দ্বীপটিতে একসময় বনাঞ্চল ছিল এবং এটি বাঘ, হাতী, শূকর, হরিণের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল।

বাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, কিল্লা প্রভৃতি দ্বীপটির প্রধান অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। উন্মুক্ত জলাশয়, মাছ চাষের পুকুর, পশুসম্পদ এবং প্যারাবন বনায়ন অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। দ্বীপটির ৭,৫৬১ হে. জমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু হয়েছে। মানুষের প্রধান পেশা কৃষি ও ব্যবসা। মাছ ধরা ও নৌকা চালান অপ্রধান পেশার মধ্যে অন্যতম। নদী ভাঙন, বসত জমির অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বীপবাসীর প্রধান দুর্যোগ। মনপুরা উপজেলা মাছের জন্য বিখ্যাত।

চর কুকড়ি মুকড়ি : চর ফ্যাশনের মূল ভূ-খন্ডের দক্ষিণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চর কুকড়ি মুকড়ি অবস্থিত। এটি ভোলার একটি অতি প্রাচীন অসংরক্ষিত দ্বীপ, যার অবস্থান রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭০) দেখানো হয়েছে। কথিত আছে, চর সৃষ্টির আদি দশায় দ্বীপটিতে অসংখ্য কুকুর আর ইঁদুর ছিল। ইঁদুর-এর আরেক নাম মেকুর আর সেই থেকেই এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় চর কুকড়ি মুকড়ি। বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেভারীজ (১৮৭০-৭৫) এই চরে ভ্রমণ করেন। ১৮৫০ সালে এই চরে মানব বসতি স্থাপন শুরু হয়। ১৮৫৮ সালে প্রথম জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানের প্রিন্স ক্রাউন ১৯২২ সালে এ চরে মোষ শিকারে আসেন।

চর কুকড়ি মুকড়ি	
আয়তন	৪,৮১০ হেঃ
প্রাকৃতিক সম্পদ	বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল, ম্যানগ্রোভ বনায়ন, কৃষি, পশুসম্পদ।
দুর্যোগ	নদী ভাঙন, নতুন জমি জেগে ওঠা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব

দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অন্যতম হল ৪ কি.মি. ব্যাপী বনাঞ্চল, ম্যানগ্রোভ বনায়ন, কৃষি (প্রধানত রবি শস্য, Saline resistant ধান) পশুসম্পদ, উন্মুক্ত জলাশয় ইত্যাদি। মাছ ধরা ও কৃষিকাজ চরের মানুষের প্রধান পেশা। এখানে একটি বন গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।

দ্বীপটি আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ততটা উন্নত নয়। দ্বীপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে একটি বণ্য প্রাণীর অভয়ারণ্য আছে যার আয়তন ২১৭ হে. এবং ১৫ কি.মি. এলাকা জুড়ে বনায়ন করা হয়েছে।

সোনার চর : এটি মনপুরা উপজেলার একটি চর। এই দ্বীপটিতে কোন প্রতিরক্ষা বাঁধ নেই। এই চরটি একসময় আয়তনে প্রায় ১,২০০ হে. ছিল। যা নদী ভাঙনের কবলে আজ ৯০০ হে. আয়তনে এসে দাঁড়িয়েছে। চরটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর মোট এলাকার ৩৪% জুড়ে রয়েছে ম্যানগ্রোভ বন। নদী ভাঙন চরটির অন্যতম প্রধান দুর্যোগ।

ঢাল চর : ভোলা জেলার সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ ঢাল চর অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাহবাজপুরের কামানের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বছর মে-জুন মাসে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে হাজার হাজার কামান বিস্ফোরণের মত শব্দ শোনা যেত। আর তা থেকেই এই শব্দ "শাহবাজপুরের কামান" নামে পরিচিত। আঞ্চলিক ভাষায় যাকে "হর" বা সমুদ্রের বান ডাকত। সাধারণত জোয়ারের সময় সাগরের নির্দিষ্ট এলাকার পানি অতি উষ্ণ হয়ে আয়তনে বেড়ে উঠলে ফুঁসে উঠত এবং ভাটার সময় তা ঢালুতে প্রবাহিত হবার সময় যে সংঘর্ষ হত সেটিই উপকূল থেকে বিকট আকারে শোনা যেত। আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগেও ঢাল চরে এই শব্দ শোনা যেত। তবে এ প্রসঙ্গে মি. এইচ বেভারীজ-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তার মতে, এই শব্দ সম্ভবত সাগরের অতল তল বা Swatch of no ground থেকে সৃষ্টি হতো। আবার কারো মতে, বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনের কারণে এই শব্দ শোনা যেত।

মূলত জোয়ার-ভাটার সময় বিপরীতমুখী স্রোতের জন্য এই শব্দ শোনা যেতো বলে প্রমাণ মেলে। বর্তমানে চর সৃষ্টির ফলে সাগরকূল অগভীর হওয়ায় স্রোতের বেগ কমে গিয়েছে এবং সে জন্য এই শব্দ এখন আর প্রায় শোনা যায় না (বরিশাল বিভাগের ইতিহাস, ৪৫)।

নদী ও মোহনা : ভোলা জেলায় অসংখ্য নদী-নালা জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। পূর্বে মেঘনা নদী এই জেলাকে লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে পৃথক করেছে। আবার মেঘনারই শাখা নদী ইলিশা ভোলা জেলাকে বরিশাল বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রধান নদী মেঘনা, তেঁতুলিয়া ও শাহবাজপুর অসংখ্য ধারা, উপধারা ও জোয়ার-ভাটার খালে বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। জেলার মোট নদীপথ ১৯৪ কি.মি.। নদী বিধৌত এলাকার পরিমাণ ১,১৩৩ বর্গ কি.মি. যা পুরো জেলার আয়তনের ৩৩.২৯%। এই সব নদীতে সারা বছর ধরে জোয়ার-ভাটা খেলে এবং নাব্যতা থাকে। প্রধান নদীগুলোর শাখা নদীগুলো হল ইলিশা, গনেশপুর, বুড়াগৌরাঙ্গ, বেতুয়া ও বোয়ালিয়া।

প্রধান নদী	**মেঘনা, তেতুলিয়া ও শাহবাজপুর**
নদীর দৈর্ঘ্য	**১৯৪ কি. মি.**

মেঘনা : ষাটনল থেকে উৎসারিত হয়ে নিম্ন মেঘনা ভোলা জেলার পূর্ব পাশ দিয়ে মেঘনা নামে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। এই নদীরই তিনটি ধারা ইলিশা, তেঁতুলিয়া এবং শাহবাজপুর।

তেঁতুলিয়া : ৮৪ কি.মি. দীর্ঘ ও ৬ কি.মি. প্রশস্ত তেঁতুলিয়া নদীটির উৎপত্তি ভোলার উত্তরে মেঘনা নদীর নিম্নাংশে। এটি তেঁতুলিয়া, নিমাদি, কালাইয়া, পূর্ব মুনিয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে গলাচিপা উপজেলার বনগোপালদি স্থানে

বুড়াগৌরাঙ্গ নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তেঁতুলিয়া এখন আর আগের মত উত্তাল ও খরস্রোতা নেই; বরং আজ এর গতিপথের বিভিন্ন জায়গায় চর দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। রামনাবাদ দ্বীপটি এই নদীর পশ্চিম মুখে অবস্থিত।

ইলিশা ও শাহবাজপুর : ইলিশা নদী উত্তরে ভোলা জেলার সীমা নির্ধারণ করে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত। প্রায় ৮ কি.মি. প্রশস্ত শাহবাজপুর নদী ভোলাকে রামগতি ও হাতিয়া দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর। যার মোট এলাকা ৭,৯৯৪ হেক্টর। এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ৫,৩৭৩ হেক্টর পুকুরে, যার মধ্যে ৮৪ হেক্টর আবার চিংড়ি চাষের পুকুর এবং পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ১,০১৮ হেক্টর (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৩)।

মোট পুকুরের পরিমাণ	৭,৯৯৪ হে.
মাছ চাষের পুকুর	৫,৩৭৩ হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	১,৬০৬ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	১,০১৮ হে.

মাটি : দ্বীপ জেলা ভোলার ভূ-প্রকৃতি সমতল । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমির সর্বোচ্চ উচ্চতা মাত্র ৩ মিটার (ক্রানট্জ, ১৯৯৯)। এই ভোলা জেলা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ১৮ অর্থাৎ নতুন মেঘনা মোহনার সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এর ধূসর থেকে জলপাই রং-এর পলিময় এঁটেল মাটির উর্বরতা মাঝারি ধরনের। এখানকার উপরের স্তরের মাটি (Top Soil) মৃদু মাত্রায় অম্লীয়। উপকূলীয় বেষ্টনী এবং দ্বীপাঞ্চল - জেলার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এখানকার মাটিতে জোয়ার-ভাটার প্রভাব অপরিসীম। কেননা, বর্ষাকালে ভরা জোয়ারের প্রভাবে এখানে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আবার শুকনা মৌসুমে জমির লবণাক্ততা বেড়ে যায়।

বোরহানউদ্দীন থানার দেউলা, বোয়ালিয়া, ডাওরী আর তজুমদ্দীন থানার শশীগঞ্জের মাটি প্রধানত এঁটেল ধরনের। জেলার মধ্যভাগে দোআঁশ মাটির পরিমাণ বেশি। মাটিতে পাথর ও শিলামাটি নেই। মাটিতে বালু, পলি ও কাদার গড়পড়তা পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬%, ২৩% ও ২১% (ব্রামার, ১৯৯৬)।

মাটির ধরন	**নতুন মেঘনা মোহনার নদীপ্লাবন ভূমি**
প্রধান বৈশিষ্ট্য	**প্রধানত পলিময় এঁটেল ধরনের ও মাঝারি মাত্রায় উর্বর**

মেঘনার নিম্ন ধারার পুরনো অংশে অর্থাৎ জেলার উত্তরাঞ্চলের মাটি পলিময় এঁটেল। অন্যদিকে, জেলার দক্ষিণে অর্থাৎ মেঘনার মোহনার নিম্নাংশের নতুন জেগে ওঠা বন্যাপ্লাবন এলাকার মাটি একই রকম, কিন্তু লবণাক্ত। তবে জেলার মধ্যভাগের মাটি ততটা লবণাক্ত নয়।

নদীর ধারের মাটি নরম প্রকৃতির হওয়ায় নদী ও জোয়ার-ভাটার খালগুলোর গতি সহজেই পরিবর্তিত হয় এবং মূল্যবান উৎপাদনশীল জমি ভাঙনের কবলে পড়ে। জেলার Wave edge ১৫-২০ সে.মি। তবে, উত্তরে ইলিশা ঘাটে ২০০ সে.মি পর্যন্ত Wave edge দেখা যায়। এর বাইরে সমুদ্রবর্তী দ্বীপাঞ্চল ও নদীর ধার এলাকার মাটি খুবই কর্দমাক্ত, যেখানে পায়ে হাঁটা দুষ্কর। ভোলার মাটিতে লবণের পরিমাণ ৪->১৫ পি.পি.এম। অন্যদিকে এই জেলায় পানির লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃতভাবে কম এবং এটি ১-১০ পি.পি.এম (এস.আর.ডি.আই, ২০০১)। মাটির উপরের ও মধ্যবর্তী স্তর কিছুটা ক্ষারীয়।

বনভূমি : ভোলা জেলার ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, এই দ্বীপ জেলাটিতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছিল না। তবে এই দ্বীপাঞ্চলটির বনভূমির উন্নয়নে নতুন জেগে ওঠা চরে বনায়ন কর্মসূচি শুরু হয় সেই ষাটের দশক থেকেই। ভোলা বন বিভাগের আওতায় উপকূলীয় ভাঙন ও অন্যান্য দুর্যোগ যেমন- জলোচ্ছ্বাস, লবণ পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি প্রতিরোধ ও

মোট বনভূমির পরিমাণ	
চর কুকড়ি মুকড়ি	৮,৫৬৫ হে.
দৌলতখান	৫,১৯৬ হে.
মনপুরা	১০,৩৮৮ হে.
চরফ্যাশন	৩,৩৭৩ হে.
মোট বনভূমি	২৭,৫২৩ হে.

জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার উপায় হিসেবে উপকূলের প্রান্তে গাছ লাগান ও বনায়ন কর্মসূচি শুরু করা হয়। এর ফলে জলোচ্ছ্বাস ও ভাঙন থেকে বাঁধ রক্ষার পাশাপাশি মানব জীবন ও সম্পদ রক্ষাসহ প্যারাবন রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। সার্বিকভাবে এটি জেলার বনজ সম্পদকে সমৃদ্ধ করছে। সমগ্র ভোলা জেলা উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর আওতাভুক্ত।

জেলার মোট বনভূমির পরিমাণ ২৭,৫২৩ হেক্টর (পিডিও-আইসিজেডএমপি, ২০০৪)। উপকূলীয় বনায়ন বিভাগের আওতায় ভোলা জেলার চর কুকড়ি মুকড়িতে মোট ৮,৫৬৫ হে. এলাকায়, দৌলতখানে মোট ৫,১৯৬ হে., মনপুরায় মোট ১০,৩৮৮ হে. এবং চরফ্যাশনের মোট ৩,৩৭৩ হে. জমিতে বনায়ন করা হয়েছে।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : ভোলা জেলার সামগ্রিক প্রতিবেশে নিম্ন মেঘনার গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রভাব আছে। পূর্বের ভাঙনকবলিত এলাকা এবং উত্তর-পশ্চিমের জেগে ওঠা নতুন জমি ভোলার প্রাকৃতিক আবাসভূমিকে নানাভাবে আক্রান্ত করে। গত ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সালের নদী ভাঙন পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, নদী ও স্থানীয় উদ্ভিদ জগতের ক্ষয়ক্ষতি বা প্রজাতি হ্রাসের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে (ক্রানট্জ, ১৯৯৯)। এ ছাড়া জেলার মাটির ধরন, ঋতুভিত্তিক বন্যা ও লবণাক্ততা সর্বোপরি চরের নতুন মাটি জেলার উদ্ভিদ জগতে বিশেষ প্রভাব রাখে।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	**ফলজ ও বনজ গাছপালা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী**
প্রাণী বৈচিত্র্য	**স্তন্যপায়ী প্রাণী, জলাভূমির পাখী, নদী-খাল-সমুদ্রের মাছ**

ফলজ গাছের মধ্যে অন্যতম হল আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কলা, আমড়া, চালতা ও নারিকেল প্রধান। ঘর-গৃহস্থালির চারদিকে প্রধানত আম, কালোজাম সুপারি, নারিকেল, জামবুড়া ও মান্দর গাছ দেখা যায়। রাস্তার দু'ধারের বা Way side গাছগাছালির মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলো চোখে পড়ে সেগুলো হল- কড়ই, তেঁতুল, নিম, হিজল, বট, অশ্বত্থ, ছাতিম ও পিতরাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর গাছগাছালির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকাশিয়া, বাবলা, জারুল, কাঁঠাল, নারিকেল ও সুপারি গাছই প্রধান। এই তো গেল স্থলজ উদ্ভিদের কথা। এ ছাড়াও জেলার জলাশয় বা বিল ও পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, ভাসমান ফার্ন, পদ্ম, শাপলাসহ কচুরিপানা দেখতে পাওয়া যায়।

জেলার বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন জাতের বানর, খেঁকশিয়াল, খরগোশ, সজারু, খাটাশ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। একসময় ভোলা জেলায় পয়মাল বা ভালুক ও সাম্বার হরিণের অবাধ বিচরণ ছিল, যা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে বেজি, ধেড়ে ইঁদুর, ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, শিয়াল, উদবিড়াল এবং দুরা কাঠবিড়ালই প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে বিবেচিত।

তবে, ভোলা জেলার জীব বৈচিত্র্যে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে জলাভূমির পাখ-পাখালী। নদী তীর, জলাভূমি, রাস্তার দু'ধারের গাছ-গাছালিতে নানা প্রজাতির পাখিরা ভিড় জমায়। এখানে দোয়েল, বাবুই, টুনটুনি, লেজ নাচানি, টিলা মুনিয়া, ভাট শালিক, চড়ুই, কালিপেঁচা, ছোট ফিঙ্গে, হলদে পাখী, কাঠ ঠোকড়া, টিলা ঘুঘু, ডাহুক, বক, পানকৌরি প্রভৃতি পাখী সচরাচর দেখা যায়। এ ছাড়াও শীত মৌসুমে এখানে অতিথি পাখীরা বেড়াতে আসে। অতিথি পাখীদের মধ্যে খুন্তিহাঁস, গিড়িয়া হাঁস, লেন্জা হাঁস, খঞ্জন, চখাচখী, বাদামী কোশাই পাখী অন্যতম।

নদী ভাঙন, লবণাক্ততা আর জলোচ্ছ্বাস জেলার প্রকৃতিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই, অনেক ধরনের সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী আজ বিলুপ্ত হবার পথে। ডোড়া সাপ, গোখরা, কাছিম, কড়ি কাইট্টা ও বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ-এর অস্তিত্ব এখনো বর্তমান।

নদী-খাল ও সমুদ্রের মাছ : ভোলা জেলার নদী মোহনা ও সাগর উপকূল বিভিন্ন ধরনের মাছে পরিপূর্ণ। জেলার ভেতরে যে সব জলাশয় রয়েছে সেখানে প্রায় ২৬০ প্রজাতির দেশীয় মাছ, ১২ প্রজাতির বিদেশী (থাই ও কোরীয়),

২৪ প্রজাতির চিংড়িসহ সমুদ্রে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, কাঁকড়া ও শৈবাল রয়েছে। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, মাগুর, ফলি, কই, শিং, বোয়াল ও শোল মাছ হচ্ছে দেশীয় মাছের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে সিলভার কার্প, মিরর কার্প, তেলাপিয়া ও নাইলোটিকা প্রধান কয়েকটি বিদেশী জাতের মাছ। সাগরের অফুরান মাছের মধ্যে প্রধানত কোরাল, বাটা, মোরশোলা, বাছা, পাবদা, টাটকিনি, ভেটকি, ইলিশ, দাতিনা, তোপশে, তেরা ভঙ্গন ও ভোলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উৎস	মাছের ধরন	প্রজাতি সংখ্যা
নদী-খালের মাছ	দেশী	২৬০
	বিদেশী	১২
	চিংড়ি	২৪
সমুদ্রের মাছ	সমুদ্রের মাছ	৪৭৫
	চিংড়ি	৩৬

তৎকালীন মৎস্য বিভাগ সমগ্র বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল বিভাগের মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ফলে ১৯৬৩-৬৪ সালে ভোলা জেলার চর জঙ্গলিয়াতে প্রায় ১০.৫ একর এলাকার উপর গড়ে তোলা হয় "ভোলা মৎস্য পোনা প্রজনন/উৎপাদন কেন্দ্র" (বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার : বাকেরগঞ্জ, ১৯৮০)। চরফ্যাশনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি উপ-স্টেশন রয়েছে।

জলবায়ু : ভোলার জলবায়ু প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ। তবে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম ও শীতকালে মাঝারি শীত অনুভূত হয়। এখানে শীতকালে হিমেল হাওয়ার প্রকোপ বেশি। মার্চের প্রথম দিকে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক বাতাস বইতে শুরু করলে শীত ও গ্রীষ্মের সন্ধি হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস দ্বীপটির সামুদ্রিক জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তাপমাত্রায় তেমন একটা হেরফের অনুভূত হয় না। তবে, জানুয়ারিতে তাপমাত্রা নিচে নামতে শুরু করে। এখানে বাতাসের গতি অক্টোবর-জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সবচেয়ে কম অর্থাৎ ০.২-০.৩ মি./সে. এবং এপ্রিল-মে মাসে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১.০ - ১.২ মি/সে. (সিইআরপি, ২০০০)। জেলার বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বিভিন্ন। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৬১৪ মি.মি. (বিএমডি, ২০০০)। জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৭° সে. এবং সর্বনিম্ন ১১.৬° সে.। এখানে বর্ষায় রৌদ্রের প্রখরতা কম।

খনিজ সম্পদ

ভোলা জেলার উপকূলীয় দ্বীপ বোরহানউদ্দীন উপজেলার কাছি ইউনিয়নে একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। বিগত ১৯৯৫ সালে এই গ্যাসক্ষেত্রটি আবিস্কৃত হয়, যার নামকরণ করা হয় শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র। এই গ্যাসক্ষেত্রে ১৭৪ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস সংরক্ষিত আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১২২ বিলিয়ন কিউবিক ফুট। নদীভাঙনের ফলে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রটি আজ হুমকির মুখে। কেননা, এটি ভাঙনপ্রবণ এলাকা মির্জাকালু থেকে মাত্র ৯ কি.মি. দূরে অবস্থিত। উল্লেখ্য, বিগত ২০০১ সালে পেট্রোবাংলার বাস্তবায়িত শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র প্রকল্পের আওতায় শাহবাজপুর গ্যাস কূপ নং-১ থেকে গ্যাস উত্তোলনের সমস্ত কারিগরি বিষয় নিশ্চিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র	
সংরক্ষিত পরিমাণ	১৭৪ বি. কি. ফু.
উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ	১২২ বি. কি. ফু.

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার মোট ১,১৮,৭০০ হেক্টর জমিতে নানা ধরনের ফসলের চাষ করা হয়। জেলার ৫১% গৃহস্থের নিজ কৃষি জমি আছে (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলার চাষাবাদের জমির ১৯% এক ফসলী, ৫২% দো-ফসলী এবং ২৯% তিন ফসলী জমি। এখানে শস্য নিবিড়তা (Cropping intensity)

২০৯। ভোলায় প্রতি বছর যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় তার মাত্র ১৩% উচ্চ ফলনশীল জাতের। এলাকার জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা না থাকায় বহু জমিই অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা ভুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কৃষকের অর্থ ও শ্রম - এই দুয়েরই ক্ষতি হচ্ছে। ভোলায় প্রথম শ্রেণীর প্রতি ০.০১ হে. জমির চলতি বাজার মূল্য ৭,৫০০ টাকা (বাংলা-পিডিয়া, ২০০৩)।

প্রধান ফসল : রোপা আমন জেলার অন্যতম প্রধান ফসল। জেলার সব জায়গার মাটি, জলবায়ু ও পানি মোটামুটিভাবে শীতকালীন শস্য ফলানোর উপযোগী। তবে বোরহানউদ্দীন উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এখানে জোয়ার-ভাটায় মাটিতে লবণের স্তর পড়ে যায়, যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে।

কৃষি জমি	১,১৮,৭০০
মোট আবাদকৃত জমি	১২৪০৮৫ হেঃ
শস্য নিবিড়তা	২০৯

ধান, সুপারি, মরিচ ও মাছ জেলার প্রধান অর্থকরী ও রফতানি ফসল। আর প্রধান শস্য বলতে প্রধানত আমন ধান, আউশ ধান ও বোরো ধান এবং গমকেই বোঝায়। মাঝারি ধরনের নিচু জমিতে অল্প বিস্তর পাট চাষ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ডাল যেমন মুগ, মসুর, খেসারী ও বিভিন্ন ধরনের সব্জিসহ পিঁয়াজ, রসুন, তামাক ও আখ চাষ করা হয়। উল্লেখ্য দক্ষিণ শাহবাজপুর বা ভোলায় এক সময় প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হতো। ভোলার আমানী এলাকা এক সময় নারিকেল তেল প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল। এ ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভোলা জেলায় প্রচুর পরিমাণে সুপারি গাছ ছিল। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সুপারির জমজমাট ব্যবসা চলত। দৌলতখান, ভোলা, মির্জাকালু ছিল ভোলার প্রধান সুপারি বিক্রয় কেন্দ্র।

প্রধান ফসল	রোপা আমন, আউশ, বোরো, গম
অর্থকরী	ধান, সুপারি, মরিচ ও মাছ
রফতানি ফসল	ধান, সুপারি, মরিচ ও মাছ

লবণ উৎপাদন : এক সময় ভোলা জেলা লবণ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। জেলার কয়টি মুষ্টিমেয় পরিবার যেমন বেপারী, গোলদার ও জমাদার পরিবার লবণ প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে জেলায় বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই কয়টি পরিবার লবণ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তৎকালীন বাকেরগঞ্জ লবণ ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত ছিল। সেই সময়ে শাহবাজপুর অর্থাৎ ভোলা জেলায় প্রচুর লবণ উৎপাদিত হতো। কিন্তু, ১৮৬০ সালের পরবর্তী সময়ে বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিষেধাজ্ঞা সমগ্র বরিশাল বিভাগের লবণ মিলের উপর চরম আঘাত হানে। তবে, বৃটিশ শাসকদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভোলার মানুষ গোপনে লবণ তৈরি করত ও স্থানীয় চাহিদা পূরণ করত।

১৭৭৩ সালে আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী কাজা কাওয়াফ এখানকার লবণ শিল্পের মালিক ছিলেন এবং স্থানীয় লবণ ব্যবসায়ীদের নিয়মিত শুল্ক দিতে হতো। ভোলার লবণ উৎপাদনকারীদের 'মহিন্দর' এবং লবণ ব্যবসার জন্য যারা দাদন দিতো তাদের 'মোলাদী' বলা হতো। আর যারা লবণ গোলাজাত করতো তাদের 'গোলদার' বলা হতো। মূলত মেঘনা নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে ভোলা দ্বীপের পূর্ব উপকূলে সর্বত্র নোনা জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি হতো। উপকূলের দরিদ্র আপামর জনসাধারণ লবণ তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ভোলা দ্বীপের উৎপাদিত লবণের গুণাগুণকে নিম্নমাত্রার বলে চিহ্নিত করে লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এরই ফলশ্রুতিতে ১৮০০ সালের শুরুতে ভোলার বিদ্রোহী চাষীরা গ্রীক লবণ ব্যবসায়ী ডেমোট্রিয়াসের কুঠি আক্রমণ করে। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত এ নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মির্জাকালু, ভোলা, দৌলতখান, লালমোহন ও মনপুরার ছোট বড় সব বাজারেই লবণ বিক্রি চলতে থাকে। এটি স্বদেশী অন্দোলনের ভাবধারায় মিশে যায়। উল্লেখ্য বাংলা ১৩৩০ সনের ১লা বৈশাখ লবণসহ এক প্রতিবাদ মিছিলে জঙ্গি পুলিশ হামলা চালায় ও ক'জন বিদ্রোহী নেতা নিহত হন।

মৎস্য সম্পদ : ২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ২৯,৩৩৮ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয় এবং তা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল (২,৫১,৯ ৯৯ মে.টন) এবং বাংলাদেশ (৬,৮৫,০৮০ মে. টন) এর পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ১২% এবং ৪% (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৩)। উল্লেখ্য, নদী-মোহনায় ২২,৯৫৪ মে.টন ও বন্যাপ্লাবন এলাকায় ৬,৩৮৪ মে.টন মাছ ধরা হয়।

জলাভূমি	উৎপাদনের মে.টন
নদী মোহনা	২২,৯৫৪
বন্যাপ্লাবন ভূমি	৬,৩৮৪
মোট	২৯,৩৩৮

চিংড়ি : মৎস্য অধিদপ্তর (১৯৯৮, ২০০৩)-এর হিসেব অনুসারে গত ২০০০-২০০১ সালে ভোলা জেলায় মোট ৮৪ হেক্টর চিংড়ি ঘের থেকে ১১ মে.টন চিংড়ি উৎপাদন করা হয়। ঐ একই পরিমাণ জমি থেকে বিগত ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট ৯ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়, যা চিংড়ি ঘেরে উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।

সাল	চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা)	উৎপাদন
১৯৯৬-৯৭	৮৪ হে.	৯ মে.টন
২০০০-২০০০১	৮৪ হেঃ	১১ মে.টন

উল্লেখ্য, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ রাজাপুর ইউনিয়নের প্রায় ১ হেক্টর এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে ৫ শতাধিক চিংড়ি ঘের। উল্লেখ্য, বিগত ২০০০ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের "ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প"-র আওতায় মেঘনা তেঁতুলিয়ার পাড়ে ১৩ কি.মি. দীর্ঘ বাঁধ ও ৬টি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। যাকে ঘিরে রাজাপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি গড়ে তোলা হয়। সরকারিভাবে বাঁধের ১ হাজার হেক্টর জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের উপর দেয়া হয়।

পশু সম্পদ : জেসি জ্যাক-এর লিখিত গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে যে, "শাহবাজপুরের কৃষকরা এক সময় গো-মহিষাদিতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল", এখনো তার প্রমান মেলে। জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ২,৪৭,৪৪০ এবং পরিবার প্রতি গড়ে ৩টি করে গবাদিপশু আছে। মোট গ্রামীণ গৃহস্থের মধ্যে ৩৬% এর গবাদি পশু আছে। কৃষি শুমারি (১৯৯৬) অনুসারে জেলায় মোট ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ১,৫৮,৪০৫। হাঁস-মুরগির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। গৃহস্থের গড়ে ১১টি করে হাঁস-মুরগি আছে এবং এদের মোট সংখ্যা হল ২৯,৫৬,০০০। জেলায় মোট ৯০টি পশুসম্পদ খামার এবং ৩৯৪টি হাঁস-মুরগি খামার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	২,৪৭,৪৪০ টি
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	৩ টি
মোট হাঁস-মুরগি র সংখ্যা	২৯,৫৬,০০০ টি
ঘর প্রতি হাঁস-মুরগি (গড়)	১১ টি

দুর্যোগ

ভোলা জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। নদী ভাঙন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও পানি-মাটির লবণাক্ততা জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা বা দুর্যোগ তো রয়েছেই।

নদী ভাঙন : দ্বীপ জেলা ভোলার প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হল নদী ভাঙন। সাম্প্রতিককালে মেঘনার আঘাতে দ্বীপটির তীরবর্তী উঁচু জমি বা আইল খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যেতে শুরু করেছে। শহর রক্ষা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর জেলার দৌলতখান, বোরহানউদ্দীন, তজুমদ্দীন ও লালমোহন উপজেলার ফসলের মাঠ বন্যা ও ভাঙনের প্রভাবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা, ধনিয়া, গাজীপুর, খোরকী,

কাছিয়া ও শিবপুর এলাকা, বোরহানউদ্দীন উপজেলার মির্জাকালু, পাখিয়া, হাসান নগর; আবার তজুমদ্দীন উপজেলার চাঁচড়া, সোনাপুর, দৌলতখান উপজেলার সৈয়দপুর ও বড়ধলি এবং সর্বোপরি চরফ্যাশন উপজেলার মাদ্রাজ, আছলামপুর, চারকোলিন ও নীলকমল আজ ভয়াবহ ভাঙনের হুমকির সম্মুখীন। ইতিমধ্যে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়েছে। তজুমদ্দীন উপজেলার সোনাপুর ও দৌলতখান উপজেলার সৈয়দপুর বাঁধ ও তুলাতুলি বাঁধ ভাঙনের সম্মুখীন। ইতিমধ্যে মহাদেবপুর ডাইকের ১৫০ ফুট মেঘনার অতলে হারিয়ে গেছে। মির্জাকালু থেকে সৈয়দপুর পর্যন্ত মোট বিশটি স্থান ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। গত বছর মির্জাকালু বাজার ৬/৭ হাত পানিতে ডুবে গিয়েছিল। ইলিশার জনগণ আতংকে বসবাস করছে, কেননা ইতিমধ্যে গাজীপুর লঞ্চ ঘাটও পানিতে ডুবে গিয়েছে।

সাইক্লোন : সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস দ্বীপ জেলাটির একটি অন্যতম প্রধান দুর্যোগ। সাধারণত বর্ষার আগে (মে মাসে) আর বর্ষার শেষে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে সাইক্লোন সবচেয়ে ভয়াবহ আকারে আঘাত হানে। সাইক্লোনের আরেক রূপ বর্ষাকালীন নিম্নচাপ। এতে ২-৪ মি. পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হয়। প্রবল বাতাসের সাথে সাগরের পানিতে ভেসে যায় উপকূলবর্তী এলাকা। এই ঘূর্ণিঝড় ২৪ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। তবে, এতে যে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটে তা আকস্মিক বা স্বাভাবিক বন্যার চেয়ে অনেক বেশি।

উল্লেখ্য ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ১০টি সাইক্লোন এই জেলায় আঘাত হানে। ৪ মিটার থেকে ৯ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন জলোচ্ছ্বাসসহ সাইক্লোনের মরণ ছোবলে মানুষ, পশুসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভোলায় গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সাইক্লোনটি ঘটে ১৯৭০-এর নভেম্বরে। তবে নব্বই-এর দশকে এই জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কয়টি সাইক্লোনিক ঝড়ের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে জানা যায়, গত ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসের ঘূর্ণিঝড়টি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। ঘণ্টায় ২২৫ কি.মি. বেগে বয়ে যাওয়া এই ঘূর্ণিঝড়ে ২০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৭ সালে মে ও সেপ্টেম্বর মাসে পরপর দুটো সাইক্লোনের আঘাতে ভোলা জেলার জীবন ও সম্পদের অপরিসীম ক্ষতি হয়। এই দুটো সাইক্লোনের গতি ছিল ১৫০-২২০ কি.মি./ঘণ্টা এবং এর সাথে ৬-১০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে।

জলোচ্ছ্বাস : ভরা বর্ষায় অর্থাৎ মে-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট প্রবল বাতাসের সাথে মেঘনার পানি ফুঁসে ওঠে। ফলে, স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতায় পানি ওঠে। স্বল্পস্থায়ী এই জলোচ্ছ্বাস মেঘনা তীরবর্তী এলাকার জনপদ, ফসল, অস্থাবর সম্পত্তি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বন্যা : নদী ভাঙন, সাইক্লোনিক জলোচ্ছ্বাস, প্রবল বৃষ্টিপাত নতুন চরের নরম-কোমল মাটি, অপর্যাপ্ত বনায়ন, অবকাঠামোগত দৈন্যদশা জেলার বন্যা প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলছে। জেলার ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, বিগত পনের শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জেলা মোট আটবার ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে। বন্যা সহসাই এই জেলার জনসম্পদ, ফসল ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে।

ভরা জোয়ার : ভোলার উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চল নিয়মিতভাবে জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। বর্ষায় সামুদ্রিক জোয়ার ও সীমান্তবর্তী নদীর পানির চাপে ভরা জোয়ার সৃষ্টি হয়। এতে নদী তীরবর্তী এলাকাসহ জনপদ প্লাবিত হয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন : দৈনিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আগাম বর্ষা, নদী ভাঙন, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ও প্লাবনসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি - এই সবই জেলার জলবায়ুর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

পরিবেশ দূষণ : মানুষের অসচেতনতা-অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শহরের অবকাঠামো জেলার পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে। মাছের ঘেরে সার, রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ঘের এলাকার পার্শ্ববর্তী খাল-নালার পানিকে দূষিত করছে। ফলে এলাকায় উদ্ভিদ-জীববৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে। শহরে বর্জ্য ফেলার জায়গার অভাব পরিবেশ দূষণের আরেকটি প্রধান কারণ ।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : শুষ্ক মৌসুমে ভোলার মাটি ও পানিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে পানীয় ও সেচের পানির অভাব দেখা দেয়, যা গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য ও কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি করে। আবার জোয়ারে এলাকার জমির মাটি নোনা জলে আক্রান্ত হয়। এতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়া উপকূলবর্তী এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানি নোনায় আক্রান্ত হওয়ায় নিরাপদ পানির অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বীপগুলোর নারী ও শিশুরা এই সমস্যার মোকাবিলায় নিদারুণ কষ্ট করছে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝায়। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা জেলার সব এলাকার পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা দল ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের উপর পরিচালিত এক বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-য় দেখা গেছে, ভোলা জেলার ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন ও জীবিকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, সীমানা বিরোধ, ভূমি সন্ত্রাস, ভূমি মালিকানার দ্বন্দ্ব, কৃষি জমির অভাবসহ অর্থের অভাব, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, কাজের অভাব ইত্যাদি প্রধান বিপদাপন্নতা। জেলেদের জীবনের প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপদাপন্নতা হল প্রবল বর্ষণ, নদী ভাঙন, সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দাদন, অর্থের অভাব ইত্যাদি। তবে অর্থ ও দক্ষতার অভাব গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের জীবনে প্রধান বিপদাপন্নতা হিসেবে চিহ্নিত।

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
ক্ষুদ্র কৃষক	সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, সীমানা বিরোধ, ভূমি সন্ত্রাস, ভূমি মালিকানার দ্বন্দ্ব, কৃষি জমির অভাব, অর্থের অভাব, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, কাজের অভাব
জেলে	প্রবল বর্ষণ, নদী ভাঙন, সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দাদন, অর্থের অভাব
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	কাজের অভাব ও স্বল্প/নিম্ন মজুরি, অর্থ ও দক্ষতার অভাব
শহুরে শ্রমিক	অর্থ ও দক্ষতার অভাব

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

ভোলার মোট জনসংখ্যা ১৭.০৩ লাখ, যার মধ্যে ৮.৮৪ লাখ পুরুষ এবং ৮.১৮ লাখ নারী (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০৮। মোট জনসংখ্যার ৮৫% গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত ৮৫:১৫। ভোলা ততটা ঘনবসতিপূর্ণ নয়। প্রতি বর্গ কি.মি. -এ ৫০০ জন লোক বাস করে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি.মি.।

০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ১১৪ (বি.বি.এস., ২০০১)। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০ জন (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শহুরে জনগণ (লাখ)	২.৫
পুরুষ	১.৩
নারী	১.২
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	১৪.৪
পুরুষ	৭.৫
নারী	৬.৯
লিঙ্গ অনুপাত	১০০: ১০৮
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	১১৪
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ)	৫০০
ঘনত্বের ক্রম (৬৪টি জেলার মধ্যে)	৫৩
নবজাতক মৃত্যুর হার	৬০
<৫ মৃত্যুর হার	৯০

ঘর-গৃহস্থালি : ভোলা জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা আছে। শহুরে (.৪৭ লাখ) ও গ্রামীণ (২.৮১ লাখ) মিলিয়ে ভোলার মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৩.২৮ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে গড় জনসংখ্যা ৫ জন। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী জেলার মোট ১.৮% গ্রামীণ নারী প্রধান গৃহস্থালি আছে। জীবিকার ধরনের উপর ঘরের কাঠামো নির্ভরশীল। ঘরের কাঠামোর বিবেচনায় ভোলা জেলার ২৭% ঘরে পাকা দেয়াল এবং ৩২% ঘরে পাকা ছাদ আছে। জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ততটা উন্নত নয়। ২০০১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ১১% ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ আছে।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	৩.২৮ লাখ
শহুরে	০.৪৭ লাখ
গ্রামীন	২.৮১ লাখ
গৃহপ্রতি গড় জনসংখ্যা	৫ জন
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	১.৮%

জনস্বাস্থ্য

জেলার আর্দ্র আবহাওয়া, নিরাপদ পানি ও পয়:সুবিধার অভাব জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এক সময় কেবলমাত্র গ্রামীণ ডাক্তার **বা** কোয়াক ডাক্তাররাই জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ছিল। তাই মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল।

তবে ১৯৭৭ সালে ভোলা উপ-বিভাগীয় হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে জেলার মানুষ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সেবা পেতে শুরু করে। মাত্র ৩০টি শয্যা, একজন সহকারী সার্জন, উপ-সহকারী সার্জন, দুইজন কম্পাউন্ডার, একজন জুনিয়র স্টাফ নার্স ও ৫ জন নার্সিং এটেনডেন্ট নিয়ে এই হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয় (গেজেটিয়ার, ১৯৮০)।

বর্তমানে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলায় ১টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৭টি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪১টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ১১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আছে। জেলা সদরের একমাত্র সরকারি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা মাত্র ২৭৫ টি। মোট ৬,১৯৮ জনের জন্য একটি হাসপাতাল (সরকারি) শয্যা আছে জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা হল ডায়রিয়া, সর্দি-জ্বর, স্ক্যাবিস, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, ডেঙ্গু, হাঁপানি ও পেপটিক আলসার ইত্যাদি।

শিশু স্বাস্থ্য : ভোলা জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৯০ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ১৪% শিশুই অপুষ্টির শিকার (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। এই পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৫৮%, ৫৬% ও ৮৩% শিশু। এ ছাড়া ৪৬% শিশু ORT নিয়েছে। ভোলা জেলায় ৬২% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : এক সময় অজ্ঞতা, অসচেতনতা, অবহেলা আর রক্ষণশীলতা গ্রামীণ পয়:সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাঁধা হিসেবে বিবেচিত হতো, যেটি এখনো বর্তমান। অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক নিষ্কাষণ সুবিধাসহ অতিবৃষ্টির প্রকোপ এই দ্বীপ জেলাটির পয়:স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত করে। গ্রামীণ এলাকায় খাল-নালার উপর ঝুলন্ত পায়খানা অপর্যাপ্ত পয়:সুবিধারই বহি:প্রকাশ। ভোলা জেলার নিরাপদ পানি সুবিধার চিত্রও ততটা ভাল নয়। মূলত ১৯৭২-৭৩ সালে প্রথম বারের মত জনস্বাস্থ্য বিভাগে ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ করা হয় (গেজেট ১৯৮০)। জেলায় মাত্র ২৯% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে এবং ৫৪% ঘরে কাঁচা পায়খানা আছে। এ ছাড়া ১৭% ঘরে কোনরকম কাঁচা বা পাকা পায়খানার সুবিধা নেই। শহর ও গ্রামের পয়:সুবিধা বিশ্লেষণে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৯০% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকি ৯% পানির অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য, ভোলার ৬৪% নলকূপেই আর্সেনিকের দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ১১% মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা শুনেছেন (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের হিসেব অনুসারে (২০০২), ভোলার নলকূপের প্রতি ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১০ মাইক্রোগ্রাম যা সহনীয় মাত্রার মধ্যেই আছে। ভোলা জেলার গ্রামীণ এলাকায় ১৭০ জন লোকের জন্য একটি করে সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি.মি.-এ সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট ৩টি।

	সংখ্যা	%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গৃহ	৮৪৭৪০	২৯
অন্যান্য সুবিধাসহ গৃহ	১৫৬৪২০	৫৪
পায়খানার সুবিধাবিহীন গৃহ	৪৯২৮	১৭
কল বা নলকূপের উপর নির্ভরশীল গৃহ		৯০

শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। সাত বছর বয়সের উপরে যে মোট জনসংখ্যা রয়েছে, তাদের সাক্ষরতার হার প্রায় ৩৭%। অন্যদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সী ও তার ঊর্ধ্বের জনসাধারণের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩৯%।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৩)-এর তথ্য অনুযায়ী ভোলা জেলায় সর্বমোট ১,২৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪২৪টি হল সরকারি। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ২,৯৪,৩২৮ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৯৬%। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫,১৬৬ জন। প্রাথমিক

সাক্ষরতার হার (৭^{+})	৩৭%
প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫^{+})	৩৯%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	৬৫
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	১৩৬
কিন্ডার গার্টেন	১৬
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	২১
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,২৮৮
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২৪
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	২,৯৪,৩২৮
ভর্তির হার	৯৬
গড় বিদ্যালয় (প্রতি ১০ হাজার)	৮

বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫৭:১। জেলায় প্রতি ১০,০০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য গড়ে ৮টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যা জাতীয় গড় সংখ্যা (৬)-এর তুলনায় বেশি (প্রা:শি:অ:, ২০০৩)।

জেলার ৬৫টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ১৩,৯১৫ ও ৭৬১ অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১৮:১। আবার জেলার মোট ১৩৬টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫৩,৭১৪ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৫,৭০৩ জন। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫:১। ভোলা সদর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখা যায়।

অন্যদিকে জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৯৪টি। মোট ৩৮,৯৮৩ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ৩,৫১৫ জন শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১১:১, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল। চরফ্যাশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মাদ্রাসা দেখা যায়। এখানে দাখিল, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা মোট ৫৭টি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ২১টি মহাবিদ্যালয় আছে, যার মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১২৮২ জন এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২১:১। একমাত্র ভোলা সদরে একই সঙ্গে মহাবিদ্যালয়, ডিগ্রী ও স্নাতক মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

অভিবাসন

ভোলা জেলায় চরাঞ্চলে অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী জেলা বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা থেকে দরিদ্র ও নদী ভাঙ্গা মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলছে। জীবিকার তাড়নায় এদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। বি.বি.এস., ১৯৯১ এর সূত্রাণুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার (১৪,৭৬,৩২৮) প্রায় ৩.৪৮% অর্থাৎ ৫১,৩৭৬ জন ভোলার বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে বলা যায়, ভোলা জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই। কেননা সাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্যসেবা- এই দুই ক্ষেত্রে জেলার তেমন অগ্রগতি হয়নি।

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর)	**৩৭**
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	**৯০**
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	**২৯**
শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	**৬,১৯৮**

প্রধান জীবিকা দল

সাগরের অফুরান মাছ, ভাঙন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এই জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন নদী, সাইক্লোন, লবণাক্ততা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীনতা, দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। নদী ভাঙন ও চাষের জমির ক্রম বিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই আজ কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল - ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে।

জেলে : ভোলার উপকূলীয় এলাকায় বিশাল জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। সমুদ্রে ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আবার, মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। ভোলার মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ২৫,০০০, যা কৃষিজীবী পরিবারের ১৪%। এখানে বড় জেলে পরিবারের সংখ্যা ১,০০০। ছোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ১৮,০০০ এবং মাঝারি জেলে পরিবার রয়েছে ৬,০০০টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সমুদ্রগামী জেলেদের জীবনে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবন নাশ- এ সবই আজকালকার জেলেদের জীবনে প্রায়ই ঘটছে। এ ছাড়া, দাদন বা মহাজনী শোষণ তো রয়েছেই। জীবিকার তাগিদে অসংখ্য নারী-পুরুষ উপকূলে চিংড়ি পোনা ধরায় নিয়োজিত। সাগর পাড়ের মানুষরা নিজেদের অজান্তে সাগরের মাছের প্রজাতি ধ্বংস করছে।

কৃষক : ভোলা জেলার মোট ক্ষুদ্র কৃষক (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ - ২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১,৩৯,৮৩৫, মাঝারি কৃষক (২.৫০ - ৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ৩২,৬৬০টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০$^{+}$ একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ৫,৬৬৫টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরিবারের বিভাজনে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক কৃষি শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। জেলায় মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ১,২৭,২৭০টি।

শহুরে শ্রমিক : ভোলায় শহুরে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। নদী ভাঙন, কাজের অভাব ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের (সিইজিআইএস, ২০০৩) কারণে গ্রামের ভূমিহীন মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এদের কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, তাঁত শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় শহুরে নারী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। উপযুক্ত কাজের অভাব ও রক্ষণশীলতা এর মূল কারণ (আইসিজেডএমপি, ২০০২)।

অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯৯৯/২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভোলায় কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৭৬১ হাজার, যার মধ্যে ৭১% পুরুষ। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৫/৯৬ সালে কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল ৯৪২ হাজার (যার মধ্যে ৬২% পুরুষ) অর্থাৎ ভোলায় কর্মক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে (বি.বি.এস., ২০০১)। চলতি বাজার দর অনুযায়ী জেলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ১৬,০৯০ টাকা। ভোলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৮ হেক্টর এবং প্রায় ৪৭% কৃষি শ্রমিক পরিবার (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

মাথাপিছু আয়	১৬,০৯০
বি.বি.এস ক্রম (মাথাপিছু আয় অনুসারে)	২২
মোট শিল্পে আয়	১৩
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.২
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন গৃহ	১১

দারিদ্র্য

জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৪% দরিদ্র এবং ২৩% অতি দরিদ্র (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। এ ছাড়া জেলার মোট ৫৫% লোক ভূমিহীন এবং ৫২% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

দরিদ্র	৪৪
অতি দরিদ্র	২৩
ভূমিহীন	৫৫
ক্ষুদ্র কৃষক	৫২

নারীদের অবস্থান

বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চাকরি, ঋণ সুবিধা থেকে শুরু করে সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব - এ সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। তবে এই বৈষম্য বা অধঃস্তনতার চিত্র দেশের সব জায়গায় একইরকম নয়। স্থানিক পরিবেশ, দারিদ্র্য, শিথিল পারিবারিক বন্ধন সমাজের দরিদ্রতম নারীদের অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন বয়ে আনছে। আর তাই, নারীদের অবস্থানকে আজ আর তথাকথিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বা অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে দেখার অবকাশ নেই।

অতি সম্প্রতি, সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় ভোলা জেলা "মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : ভোলায় মোট জনসংখ্যার ৪৮% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০৮, যা সমাজে নারীর নেতিবাচক অবস্থানকে নির্দেশ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১১৫। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ৯৫ (বি.বি.এস., ২০০১)।

- ১৫-৪৯ বছরের লিঙ্গ অনুপাত ৯৫, যা জাতীয় অনুপাতের (১০০) তুলনায় কম।
- মোট ৪৭% প্রজননক্ষম নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) তুলনায় অনেক বেশি ।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় হারের (৯২) সমান।
- স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা (০.১৫%) জাতীয় সংখ্যার (০.৩৭%) তুলনায় কম।
- কৃষিজীবী নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা জাতীয় সংখ্যার তুলনায় কম।
- পুরুষ-নারীর অনুপাত (১০৮) জাতীয় অনুপাতের তুলনায় বেশি (১০৬.৬)।
- সাক্ষরতার হার (৩৪%) জাতীয় হার (৪৫%) এর তুলনায় কম।
- মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার জাতীয় হারের তুলনায় কম।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম।

বৈবাহিক অবস্থান : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যা হল ১১.৩৪ লাখ। এর মধ্যে ৩২% নারী বিবাহিত এবং ০.১৫% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৭% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের মোট প্রজনন হার ২.৫ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২.৫টি সন্তান জন্ম দেয়। পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬.৩২, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৪৭% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের

কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে নারীদের গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত হওয়া এখন প্রায়ই চোখে পড়ে। সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সর্বোপরি ধর্মীয় অনুশাসন ও কুসংস্কার এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাঁধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

শ্রমশক্তি : ভোলার নারীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির হার ক্রমশ কমছে। ভোলা জেলার নারীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ক্রমশ কমছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগণের ৩৮% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৯% (বি.বি.এস. ২০০১)। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ৩৪% শহুরে নারী এবং ২৯% গ্রামীণ নারীদের উপস্থাপন করে যা শহুরে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত অধ:স্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই, গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৬% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস, ১৯৯৬)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২৫% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬%।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। ভোলার নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা ভোলার নারীদের স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করে তুলেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ১৭%, যা জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়:সুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৯% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন এবং ৯৩% ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ৪% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৩% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা : ভোলার নারীদের সাক্ষরতার হার ততটা সন্তোষজনক নয়। কেননা ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৪% যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার (৩৫%)-এর চেয়ে কম (বি.বি.এস., ২০০১)। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভোলার মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্রছাত্রীর ৫০% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৮%। একই চিত্র স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীদের ৪৯% ছাত্রী। মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫৭% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৩৫% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ ভোলা জেলার নারীর উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ কম।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতি পরিচিত ঘটনা। স্থানীয় জনমত অনুসারে জেলায় এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ নির্যাতনের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে। দ্বীপাঞ্চলে দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এর নেপথ্যের অন্যতম কারণ।

অবকাঠামো

রাস্তাঘাট

বি.বি.এস., ২০০৩-এর তথ্য অনুযায়ী, জেলায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের মোট ৫১০ কি.মি. রাস্তা আছে। যার মধ্যে ৪৯৭ কি.মি. হল ফিডার রোড-এ ধরনের এবং ১৩ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) ৭৪ কি.মি. ফিডার রোড- বি, ৫৪৯ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা-৪৩২ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা ধরণ-২ রয়েছে। জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৪৬ কি.মি./ বর্গ কি. মি. ।

জেলার বিচ্ছিন্ন এলাকা বা দ্বীপাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ঘটলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যোগাযোগ সুবিধার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করার সুযোগ পাবে। দ্বীপ ও মূল ভূ-খণ্ডের মানুষের মধ্যে সম্ভাবনার সেতু রচিত হবে। উল্লেখ্য ভোলা জেলায় বন্যা, লবণাক্ততা প্রতিরোধ, কৃষি ও সেচ কাজের উন্নয়নসহ বিদ্যুৎ শক্তির কল্যাণমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত ১৯৬৩-১৯৭৯ সালের মধ্যে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এর প্রভাবে আজকের ভোলায় অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবর্তনের চিত্র সহজেই চোখে পড়ে।

পাকা রাস্তা	**১,৫৬৫ কি.মি.**
সওজ রাস্তা	**৫১০ কি.মি.**
এলজিইডি রাস্তা	**১,০৫৫ কি.মি**
রাস্তার ঘনত্ব	**০.৪৬কি.মি./ বর্গ**

নৌ-পথ

ভোলা জেলার নদী নালার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে নদী-নালা গুরুত্ব বহন করে আসছে। জেলার অন্যতম প্রধান নৌযান নৌকা। এই সব নৌকার আকার, ধরন ও নকশায় অনন্য বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রধান যে কয়টি ধরনের নৌকা ভোলায় দেখা যায় তা হল ঘাসী নৌকা (যা কিনা অপ্রশস্ত নালা বা খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে চলাচলে সক্ষম); গয়না নৌকা (অপ্রশস্ত নালা খাঁড়ি ও নদী উভয় পথেই যাত্রী পরিবহনে সক্ষম); তাবুইয়্যা (জেলার সর্বত্রই অতি পরিচিত)। এ ছাড়া "পিনিশ" নৌকা উচ্চবিত্তদের মধ্যে অতি পরিচিত।

উল্লেখ্য, ভোলা জেলার নদী বন্দর ও নৌঘাট গুলোর অবস্থা শোচনীয়। নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং মাস্তানদের দৌরাত্মের কারণে জেলার নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। ভোলায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কার্যক্রম গত ১০ বছর ধরে বন্ধ আছে। ফলে, জেলার পাঁচটি নৌপথ বা নৌ-রুটের যেমন ভোলা খেয়া ঘাট, ভোলা ইলিশা ঘাট, দৌলতখান চকিঘাট, বোরহানউদ্দীন লঞ্চঘাট ও লালমোহন লঞ্চঘাটের শতাধিক যানবাহন স্বাভাবিক চলাচলে প্রতিনিয়তই সমস্যার মুখে পড়ছে। অন্যদিকে, জেলা সদরের খেয়াঘাট পল্টুন সম্প্রসারণ না করায় যাত্রীরা অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। যদিও ভোলা

খেয়াঘাটে বিআইডব্লিউটিএ-র একটি দোতলা অফিস ভবন রয়েছে, বর্তমানে এই জরাজীর্ণ ভবনে বহিরাগতদের আড্ডা বসে, যার আশু সমাধান অত্যন্ত জরুরি।

পোল্ডার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে ভোলার জনবসতি-সম্পদ রক্ষা ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বিগত ষাটের দশকে পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চর ফ্যাশন, ভোলা সদর, বোরহানউদ্দীন, দৌলতখান ও মনপুরা উপজেলায় মোট ৬টি পোল্ডার আছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১,৪৩,৪৬৫ হেক্টর জমি রক্ষা করা গেছে। এ ছাড়া জেলায় প্রায় ৩৮৩ কি.মি. দীর্ঘ বেড়ি বাঁধ রয়েছে। সমস্ত পোল্ডার এলাকায় মোট ৪৪টি রেগুলেটর, ২০টি ফ্লাশিং ইনলেট এবং ১৯১ কি.মি. দীর্ঘ নিষ্কাশন খাল রয়েছে (সি.ই.আর.পি, ২০০০)।

উল্লেখ্য জেলার উপকূলবর্তী বাঁধ ও দ্বীপাঞ্চলের বাঁধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার অভাব, দুর্বল বাঁধ, বাঁধের ফাটল ইত্যাদির কারনে নদী ভাঙন তীব্রতর হয়ে পড়ছে ফলে এ সব এলাকায় লোনা জলের প্রবেশ, প্লাবন, ফসলহানি ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাঁধ	৩৮৩ কি.মি
রেগুলেটর	৪৪ টি
ফ্লাশিং ইনলেট	২০টি
নিষ্কাশন খাল	১৯১ কি.মি.

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ২০৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এ সব আশ্রয়কেন্দ্রে জেলার মোট জনসংখ্যার ২৪% আশ্রয় নিতে পারে (এলজিইডি, ২০০৪)। এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময় জান-মালের নিরাপত্তা দেয় আর অন্য সময়ে বিদ্যালয় ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭০-এর সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও তজুমদ্দীন উপজেলায় বহু লোক প্রাণ হারায়।

হাট-বাজার ও বন্দর

মানুষের চাহিদা ও ভোগ্য পণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাটবাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায় মোট ১৮০টি হাটবাজার রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যাংক হাট, দেওলা, রামনেওয়াজ, চরফ্যাশন, গোলদার, লেধারগঞ্জ, চেয়ারম্যান বাজার, দৌলতখান হাট, বাংলা বাজার, রামগঞ্জ, হরিগঞ্জ, নাজিরপুর ইত্যাদি। এখানে ১২২ বর্গ কি.মি. অন্তর অন্তর ১টি করে হাটবাজার কেন্দ্র আছে।

জেলায় বছরে ৬টি বড় মেলা বসে। এর মধ্যে তজুমুদ্দীন উপজেলার ঠাকুর মেলা ও মনপুরা উপজেলার কৃষ্ণ প্রসাদের মেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাটবাজারের খতিয়ান

উপজেলা	হাট বাজারের সংখ্যা
ভোলা সদর	১৬
দৌলতখান	২০
বোরহানউদ্দীন	৩০
তজুমদ্দীন	১১
মনপুরা	১৬
লালমোহন	৪২
চরফ্যাশন	৪৫
মোট	১৮০

ভোলা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম এবং নৌপথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত। জেলার মোট ২টি লঞ্চ ঘাট এবং ৫টি উপকূলীয় দ্বীপ নৌ/জেটি রয়েছে। জেলায় কোন রেল সংযোগ নেই। দ্বীপগুলোতে বন্দর স্থাপিত হলে দ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ একদিকে যেমন তাদের উৎপাদিত বা আহরিত পণ্য বাজারজাত করার সুবিধা পাবে, অন্যদিকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে। চর মনপুরার জনতা বাজার ঘাটটির উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ

ভোলা জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ৩৫,৮০০, যা মোট ঘরের ১১%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৩৭% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ৬%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ৩% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল (বি.বি.এস., ১৯৯৪, ২০০১)।

১৯৭৪-৭৬ সালের মধ্যে ভোলায় এ.সি. পাওয়ার স্টেশনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময় এই পাওয়ার স্টেশন থেকে ১.১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো। পল্লী বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভোলা ষ্টেশন থেকে ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দীন, তজুমদ্দীন, মনপুরা, লালমোহন আর চরফ্যাশন উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করাহয়। পল্লী বিদ্যুতায়ণ বোর্ডের আওতায় জেলার ৭টি উপজেলার মোট ৩,৪০৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ১০১৯টি (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

% শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	৩৭%
% গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	৬%
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	৩,৪০৩ বর্গ কি.মি.

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

কৃষিক্ষেত্রে প্রাচুর্য, লবণ শিল্প সম্ভাবনা আর নদী-মোহনা-সাগর উপকূলের অনন্য প্রাকৃতিক শোভার কারনে তৎকালীন বাকেরগঞ্জে বহু বিদেশী পর্যটক, ব্যবসায়ী, চীন ও আরব সওদাগরদের আগমন ঘটে। এদের অনেকেই ভোলায় ঘাঁটি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। তবে কালের ধারায় এই দৃশ্যপট বদলে গেছে। ইংরেজ শাসনামলে বৃহত্তর বরিশাল জেলায় শিল্পের তেমন একটা বিকাশ ঘটতে পারেনি। ফলে ভোলা জেলায় নামেমাত্র গুটিকয়েক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এই সময় ভোলার আমানীতে নারিকেল তেল প্রস্তুতের বিখ্যাত কারখানাটি গড়ে ওঠে।

প্রত্যন্ত অঞ্চল, অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপ্রতুল অবকাঠামো জেলার শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। উল্লেখ্য, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণে ভোলা জেলায় লবণ শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা অকালে হারিয়ে গেছে।

তবে জেলায় মৎস্য, কৃষি ও পশু সম্পদের যে বিকাশ শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিপণ্য ও মাছ হল জেলার প্রধান বাণিজ্য উৎপাদন। তাই এখানে ক্রমবর্ধমান হারে গড়ে উঠছে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ও পোলট্রি খামার। বর্তমানে মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে মোট ৩৩০টি মাছের খামার, ৮৮টি হ্যাচারী ও ১টি বড় চিংড়ি খামার আছে।

বড় শিল্প কারখানার মধ্যে ধান কল, বরফ কল, কাঠের কল, আটা-ময়দার কল, তৈল কারখানা, সাবান কারখানা, রুটি ও বিস্কুট তৈরির কারখানাসহ লেদ ও লোহার কারখানাই প্রধান।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পভিত্তিক কারখানার ক্ষেত্রে তাঁত, কামার, কুমার, বাঁশের কাজ, মাদুর তৈরির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)।

উল্লেখ্য ভোলা জেলার শিল্প খাতের সাম্প্রতিক সংযোজন হল "মনপুরা ফিশারীজ লিমিটেড"। প্রায় ২৫০ একর জমির উপর এই খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে একই সাথে গলদা, বাগদা চিংড়িসহ নানা জাতের দেশী মাছ চাষ করা হয়। এই বিশাল মৎস্য খামারটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম, খামারের চারিদিকে প্রায় ১০০০টি নারিকেল, ৫০০০টি মেহগনি, ৫০০০টি শিশু, ১০০০টি রেন্ডি গাছ ও বহু ফলের গাছ লাগানো হয়েছে। এই খামারটি আজ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এখানে আরো রয়েছে "মনপুরা বহুমুখী খামার"। একই মালিকের উদ্যোগে এটি স্থাপিত হয়েছে; যেখানে একযোগে গরু, ছাগল, মোষ, হাঁস-মুরগি পালন করা হয়। গাছ-গাছালির মনোরম শোভা খামারের বৈশিষ্ট্যে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।

সেচ ও গুদাম সুবিধা

জেলার কৃষিজীবী লোকেরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে সাধারণত নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এল.এল.পি. পাম্প ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। জেলায় মোট ১,২৪,০৮৫ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়। এর মধ্যে ২৪,৭৬৭ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয় অর্থাৎ মোট চাষাবাদের জমির মাত্র ২০% সেচের আওতাভুক্ত। সেচ কাজে ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রধানত লো লিফট পাম্পের (এল.এল.পি) ব্যবহার দেখা যায়। কৃষি অধিদপ্তর (২০০১)-এর হিসাব অনুসারে ভোলায় সক্রিয় এল.এল.পি-র সংখ্যা ১,৮৪৫টি, জেলায় অগভীর নলকূপের ব্যবহার নেই।

ভোলা জেলায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পণ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণের সুবিধা আছে। বি.বি.এস., ১৯৯৮-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মোট ২৮টি খাদ্যগুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির খাদ্যদ্রব্য ধারণ ক্ষমতা হল ৩১,০০০ মে. টন। এ ছাড়া, এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য ১১,১৫০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৭টি গুদাম আছে। আর সারের জন্য রয়েছে ৩,২০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৭টি গুদাম।

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	২৮	৩১,০০০
বীজ	১৭	১১,১৫০

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জেলায় মোট ৪৮টি ছোট-বড় এন.জি.ও, ৩৫৩টি ক্লাব, ৫টি পাবলিক লাইব্রেরি, ২৩টি সিনেমা হল, ২৬টি সুশীল সমাজ, ৬৫টি নারী সংগঠন, ১০টি থিয়েটার দল, ৩০১টি সমবায় সমিতি, ২টি মহিলা ক্লাব, পোস্ট অফিস ৯২টি ও ১টি শিল্পকলা একাডেমী রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেলায় মোট ২২০০টি মসজিদ, ১২৩টি মন্দির, ৫টি মঠ ও ১টি আখড়া আছে। এ ছাড়াও আছে ২১টি বিয়ে নিবন্ধন কেন্দ্র ও ৩৩টি কম্যুনিটি সেন্টার ।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে ভোলায় মোট ১০টি সরকারি সংস্থার মোট ১৫টি প্রকল্প ভোলা জেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যেসব প্রকল্প কেবল ২০০৪ সালের জুন মাসের পরেও চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে।

যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা হল - বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পেট্রোবাংলা, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি।

এই প্রকল্পগুলো প্রধানত বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP), নেদারল্যান্ডস সরকার (GoN), যুক্তরাজ্য সরকার (DfID), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDA), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA), ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (GEF), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), ইউনিসেফ (UNICEF)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।

বর্তমানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও এজেন্সি হল- ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প ২য় পর্যায় (বাপাউবো); সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ওয়ারপো); বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এলজিইডি); চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প এবং সমন্বিত মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (মৎস্য বিভাগ); উপকূলীয় অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প (ডিপিএইচই); গ্রামীণ জীবিকায়ন প্রকল্প (বিআরডিবি); ইলিশা-ভোলা-চরফ্যাশন-চর মানিকা আঞ্চলিক রাস্তা গঠন প্রকল্প (সওজ); খাদ্য নিরাপত্তাহীন নারীদের উন্নয়ন প্রকল্প (ডিডব্লিউএ); শাহবাজপুর গ্যাস প্রকল্প (পেট্রোবাংলা), পিবিএস উপ-স্টেশনে ৩৩ কেবি সংযোগ লাইন গঠন প্রকল্প (আরইবি) ইত্যাদি।

সরকারি সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
মৎস্য বিভাগ	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	২
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১
পেট্রোবাংলা	১

এ ছাড়া কোস্ট এনজিও দুটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্প দু'টি হল আত্মনির্ভরশীল বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ দল ও ইউনিয়ন পরিষদ (SSEMP) এবং সাস্‌টেইনেবল মৎস্য চাষ প্রকল্প। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেলার স্থানীয় ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোও কাজ করছে। আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস, অ্যাকশন এইড, ভিশন, চর উন্নয়ন প্রকল্প, বন্ধুজন পরিষদ, রাসা, কোস্ট ও সমাজ উন্নয়ন জেলার অন্যতম প্রধান কয়টি বড় ও স্থানীয় এনজিও।

প্রধান চারটি বড় এন.জি.ও- আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা ও কারিতাস-এর ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলার মোট ১২% গৃহস্থ। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৫,৮৫৮ টাকা মাত্র (আইসিজেডএম, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দু:স্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	৩৮,২৭০
% গৃহস্থ (মোট)	১২%
মোট ঋণের পরিমান (কোটি টাকা)	২২.৪২
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমান (টাকা)	৫৮৫৮

হোটেল বা অবকাশ যাপন কেন্দ্র

ভোলা জেলায় আভ্যন্তরীণ পর্যটন এলাকা হিসেবে সম্ভাবনাপূর্ণ। এখানে পর্যটকদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে কোন হোটেল, মোটেল বা অবকাশ যাপন কেন্দ্র গড়ে উঠেনি।

মেঘনার ভাঙনে তজুমদ্দিনের দুটি ইউনিয়ন প্রায় বিলীন : মাটিচাপায় ৩ জনের মৃত্যু

ভোলা প্রতিনিধি

বরিশালের দপদপিয়া ঘাটে ভাঙন : বিদ্যুৎ টাওয়ার হুমকির মুখে

ভোলার গ্যাস বেচে ভোলাকে বাঁচান

● ভোলাবাসীর দাবি : জেলা ও শহর রক্ষা কমিটি গঠন

ভোলা-লক্ষ্মীপুর নৌরুটে সি-ট্রাক বন্ধ হয়ে গেছে

চরফ্যাশনে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন

ভোলা শহর রক্ষা বাঁধের নতুন অংশে ভাঙন

বেড়িবাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে আড়াই হাজার পরিবার

Erosion takes serious turn in Bhola

রাজাপুরে বিষখালী নদীর অব্যাহত ভাঙন

ভোলায় শহররক্ষা বাঁধ ধসে ১০টি গ্রাম প্লাবিত

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

ভোলা জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই এসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে, সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বণ্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে ওঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

নদী ভাঙন : সাম্প্রতিক সময়ে ভোলা সদরে মেঘনার ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মেঘনার ভয়াল ছোবলে তজুমদ্দীন উপজেলার চাঁদপুর ও সোনাপুর, কাছিয়া ও ইলিশা ইউনিয়ন আজ মারত্মক হুমকির সম্মুখিন। মানুষের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। বর্তমানে ইলিশা জিরো পয়েন্ট থেকে তজুমদ্দীন উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৬ কি.মি. দীর্ঘ বাঁধ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিবেশগত সমস্যা
- নদী ভাঙন
- সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস
- বন্যা
- জলাবদ্ধতা
- মাটি-পানির লবণাক্ততা
- পরিবেশ দূষণ
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- জলবায়ুর পরিবর্তন

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- ভূমি বিরোধ
- বিপদাপন্নতা

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা
- উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব
- হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নদী ভাঙন প্রতিরোধে এলাকাবাসী প্রায়ই সোচ্চার হয়ে ওঠে। চলতি বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই মেঘনা নদীর পাড়ে ব্লক বসানোর দাবীতে মিছিল ও সমাবেশ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এলাকাবাসী তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নদী ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলেছে (প্রথম আলো, এপ্রিল ২০০৪)। ভাঙন প্রতিরোধে আশু ও যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার দাবীতে কয়েক হাজার ভাঙনপীড়িত মানুষ কাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে স্মারকলিপি দেন।

উল্লেখ্য বিগত ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ভোলা জেলা রক্ষার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তবে অর্থের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ ছাড়া নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থায়নে ইলিশা ঘাট ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পটি নানা জটিলতায় আর প্রণয়ন করা হয়নি। এ ছাড়াও গত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে মেঘনার ভাঙন প্রতিরোধের একটি জরিপে প্রকল্প হাতে নিয়ে বাস্তবায়িত হয়নি। ভোলার আকার এই মেঘনা নদীর প্রভাবে প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে।

বন্যা : নদী ভাঙন, নতুন চরের কোমল মাটি, অপর্যাপ্ত বনায়ন, দুর্বল অবকাঠামো জেলার বন্যা প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলছে। জেলার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত পনের শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জেলা মোট আটবার ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে। আকস্মিক বন্যায় পানির স্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে পানি আবার দ্রুত সরেও যায়, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

সাইক্লোন : সাইক্লোনের কারণে জেলার মানুষের জীবন চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। আপদকালীন নিরাপত্তা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব ও অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে।

জলোচ্ছ্বাস : প্রতিবছর জলোচ্ছ্বাস দ্বীপাঞ্চলের ফসল, মানব জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। গত ২০০৩ সালের শেষভাগে জলোচ্ছ্বাসে চর তজুমদ্দীন, দৌলতখান ও সদর উপজেলার ফসলের মাঠ, রোপা আমনের চারা, পুকুরের মাছ, হাঁস-মুরগি, পশুসম্পদের ক্ষতিসহ মানুষের জীবনহানি ঘটে। নদী ভাঙন প্রতিরোধ, বাঁধের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পুন:সংস্কার এবং দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই সমস্যার প্রতিকার করা দরকার; নয়তো প্রতিবছর জলোচ্ছ্বাসের কবলে ফসল, সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি ভোলাবাসীর জীবনে অভিশাপ বয়ে আনবে।

জলাবদ্ধতা : জেলা শহরের ভৌত আবোকাঠামোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। পর্যাপ্ত নিষ্কাশন সুবিধার অভাবে প্রবল বর্ষণের ফলে জমে থাকা পানি সরে যেতে পারে না। ফলে ভোলার শহর ও গ্রাম এলাকায় জলাবদ্ধতা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি কাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে।

মাটি-পানির লবণাক্ততা : অনিয়ন্ত্রিত-অপর্যাপ্ত বাঁধ আর দুর্বল অবকাঠামো জেলার মাটি-পানির লবণাক্ততা বিশেষত দ্বীপাঞ্চলের মানুষের জীবনকে আক্রান্ত করছে বেশি।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : সাগর উপকূলে অতিরিক্ত মাছ আহরণ ও চিংড়ি পোনা ধরার কারণে সাগরের মাছের প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে। আর তাই সাগর উপকূলে মাছের সংকট বাড়ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা"কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি-শ্রমিক ও গৃহিণিদের "সম্পদ ও নিরাপত্তা"কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : নিষ্কাশন কাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি, পর্যাপ্ত পৌর-সুবিধার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এ ছাড়া শহরের ড্রেন ও নালায় বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট বড় দ্বীপগুলোতে মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ সন্ত্রাসী মহলের অপতৎপরতায় অতিষ্ঠ। দ্বীপাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রম অবনতি আজকের ভোলাবাসীর জীবনের একটি চরম দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, জমি দখল, ফসল ও মাছ হরণ, বসতি উচ্ছেদসহ নারী নির্যাতন দ্বীপাঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ চর জহিরুদ্দীনের কথা বলা যায়, যেখানে এলাকার নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় চেয়ারম্যানের লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এলাকাবাসী বিভিন্নমুখী কাজকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

মেঘনাঞ্চল আজ অনেকাংশেই জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রনে। মাছ ধরা নৌকা বা ট্রলার ডাকাতি, গণলুট, জেলে অপহরণ, মুক্তিপণ, আক্রমণে চাঁদপুরের জেলেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এলাকার মানুষ একদিকে যেমন মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষিসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত করতে না পারায় জেলার অর্থনীতি দুর্বল থেকে যাচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম।

নৌ-যোগাযোগ বা খেয়াঘাট/পল্টুনের উন্নয়ন : বর্তমানের নৌপরিবহন সমস্যা দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট দফতরের বছরের কাজ জেলার পাঁচটি নৌ-রুট বা বিআইডব্লিউটিএ-র পল্টুনগুলো ইজারা দেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংস্কার কাজ, ঘাট পাইলিং কাজ, অ্যাপ্রোচ জেটি তৈরির কাজ, নাইট নেভিগেশন বা বিকন বাতি স্থাপন, রুট বয়া স্থাপন, রুট পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এসব কাজ কখনোই তেমন একটা করা হয়নি। রুট বয়ার অভাবে দৌলতখান চকিঘাটে স্টিমার মেইল সার্ভিস বিগত মার্চ ২০০৪ থেকে বন্ধ রয়েছে। আবার ইলিশা পল্টুন (টার্মিনালের) অ্যাপ্রোচ জেটি পল্টুন স্থাপনের পর থেকেই নেই। ফলে, সি-ট্রাকসহ লঞ্চগুলোকে দূরে সরে ভিড়তে হয় এবং যাত্রীরা নিদারুণ দুর্ভোগের শিকার হয়। উল্লেখ্য বরিশাল বিভাগীয় কর্মকর্তারা এসব স্থান পরিদর্শন করে যাওয়ার পরও তেমন কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

সীমানা বিরোধ : ভোলার সীমান্তবর্তী চরগুলোতে সীমানা বিরোধ একটি অতি পরিচিত ঘটনা। যুগ যুগ ধরে বিরাজমান এই সীমানা বিরোধের কারণে কত নিরীহ কৃষক যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোন হিসাব নেই। অনেক কৃষক পরিবার হয়েছে ভিটা ছাড়া। স্বাধীনতা উত্তরকালীন সময় থেকে এই সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির বহু উদ্যোগ নেয়া শুরু হয়েছে এবং বছরের পর বছর ধরে বহু মামলা মোকদ্দমা ঝুলে রয়েছে, কিন্তু সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। আর তাই প্রতি বছর ধান কাটার মৌসুমে এই বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

ভোলা জেলার সাথে প্রতিবেশী বরিশাল, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর জেলার সীমান্তবর্তী চরগুলোর মালিকানা নিয়ে বিরোধ চলছে যুগযুগ ধরে। উল্লেখ্য, ভেদুরিয়া, ঠেকিপাড়া, নতুনচর, চর হোসেন, চর সীতারাম, চর বাগর ও টুম চরের মালিকানা নিয়ে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার সঙ্গে ভোলা সদরের বিরোধ রয়েছে। আবার বোরহানউদ্দীনের চর ব্যারেট, চর লতিফ, চর কুঞ্চ ও চর বিশ্বাসের মালিকানা নিয়ে পটুয়াখালীর বাউফলের সাথে এবং দৌলতখানের চর নলডুঙ্গী ও চর গজারিয়ার মালিকানা নিয়ে ভোলার রামগতি উপজেলার সাথে বিরোধ রয়েছে। শুধু তাই নয়, পটুয়াখালী ও দশমিনার সঙ্গে ভোলার লালমোহনের চরহাদী ও চর কচুয়া নিয়ে বিরোধ রয়েছে। বর্তমানে পটুয়াখালী ও গলাচিপার সঙ্গে চরফ্যাশনের সীমান্তে চর মেনোহর, চর মোতহার ও চর লিইননের হাজার একর জমির দখল নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। সীমানা বিরোধ সারা বছর সুপ্ত থাকলেও ধান কাটার মৌসুমে চরে চরে দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুটপাট, খুন-খারাবি শুরু হয়। চরের ভূস্বামীদের লাঠিয়াল বাহিনীর তৎপরতা, দুর্বল প্রশাসন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে এর কোন সমাধান হচ্ছে না।

ভূমি সন্ত্রাস : অব্যাহত সীমানা বিরোধ থেকে জন্ম নেয় ভূমি সন্ত্রাস। যার হাতে জিম্মি হয়ে আছে ভোলার চরাঞ্চলের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ। স্থানীয় ও ভাড়াটে লাঠিয়াল বাহিনীদের আক্রমণ ও অস্ত্রবাজির কাছে স্থানীয় প্রশাসনও প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না। অপহরণ, খুন, অগ্নিসংযোগ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লুটপাট, শস্য ছিনিয়ে নেয়া থেকে শুরু করে ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা পর্যন্ত অহরহ ঘটছে। কৃষককে তার উৎপাদিত ফসল থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে প্রায়ই।

ভূমি মালিকানার দ্বন্দ্ব : ভোলার চরাঞ্চলে ভূমি মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অতি পরিচিত একটি বিষয়। যে সব কারণে সাম্প্রতিককালে এ সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করছে, তা হল - বৈধ মালিকানার জমি বন্দোবস্ত দেয়া, ভূমি অফিস থেকে ভুয়া ডিসিআর নেয়া, একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে ডিসিআর প্রদান, ভূমিগ্রাসীদের সাথে পাল্লা দিয়ে কাগজপত্রের মারপ্যাঁচ ইত্যাদি। এ সব বিষয়কে পুঁজি করে ভোলার চরাঞ্চলে ভূমিগ্রাসী দালাল এবং ভূমি সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত সক্রিয় এবং বিভিন্ন চরে গিয়ে তারা মালিকানা বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে, পারিবারিক সহিংসতা আর দারিদ্র্য বেড়েই চলছে। জেলার চরের ভেতরে বসতি স্থাপন ও জীবিকা নির্বাহের নিরাপত্তা অনিশ্চিত পড়ছে ।

রেণু উৎপাদন : জেলার মাছ চাষীদের ফেনী, রায়পুরসহ বাগেরহাট এলাকা থেকে মাছের রেনু পোনা সংগ্রহ করতে হয়। কেননা, জেলার একমাত্র মৎস্য রেণু উৎপাদন কেন্দ্রটি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। ১৯৮৪ সালে ভোলা শহরের দক্ষিণে ভোলা সরকারি কলেজের বিপরীতে ৫ একর জমির উপর কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এরপর কিছু দিন রেণু উৎপাদন করার পরই কেন্দ্রটি নানা অনিয়মের মুখে পড়ে। এতে করে ১৯৯৪ সালের শুরুতে এই হ্যাচারির কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। আজ এর গভীর নলকূপগুলো, মিনি হাউজ ও ডিম ফুটানো ড্রাম অকেজো হয়ে রয়েছে। ১৪টি পুকুরের মধ্যে ১০টি শুকিয়ে গেছে। এটিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তা গো-চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

রাজাপুর রক্ষাবাঁধ : মেঘনার কড়াল গ্রাসে রাজাপুর রক্ষা বাঁধের বিভিন্ন অংশ ধসে যাওয়ায় রাজাপুর ইউনিয়নের চিংড়ি চাষীরা চরম বিপাকে পড়েছে। সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে এখন প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

বিপদাপন্নতা : বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-তে জেলার প্রধান জীবিকা প্রধানত প্রাকৃতিক, ভৌত ও সামাজিক বিপদাপন্নতার শিকার। এর ফলে জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রাম ও শহরের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠছে।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

নৌ-বিহার : দ্বীপ জেলা ভোলার নদী-নালা-খালের বিস্তৃতি নৌ-বিহারের জন্য উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নানা জটিলতার কারণে এটির যথাযথ বিকাশ ঘটছে না। সরকারি ও বেসরকারি বা ব্যক্তিখাতে উদ্যোগের অভাব, নৌ-ঘাট পল্টুন বা খেয়াঘাটের দৈন্যদশা, আধুনিক নৌ-যানের অভাবের কারণে ভোলার নৌ-বিহারের সম্ভাবনা বাঁধা পড়ে আছে। যথাযথ উদ্যোগ বা হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সহায়তায় ভোলায় নৌ-বিহারের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

দ্বীপ ট্যুরিজম : ভোলার ছোট বড় সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত দ্বীপগুলো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। দ্বীপ ট্যুরিজমের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে যে ধরনের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন। তা না থাকায় ভোলা জেলার এই অপার সম্ভাবনাময় দ্বীপাঞ্চল আজ অনেকাংশেই অবহেলিত।

উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব : দ্বীপাঞ্চল ও ঐতিহ্যবাহী ভোলার স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় হল উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে।

হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র : পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে জেলার দ্বীপাঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এই হোটেলগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত "পর্যটন গাইড" নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগম হবে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা : প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলে নিরাপত্তা একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়।

ভোলাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ

শাহবাজপুর ফিল্ডের গ্যাস আসছে ভোলা শহরে

উপকূলীয় মেঘনায় ইলিশ

Bumper wheat yield expected in Bhola

ভোলায় জেলেদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য

মেঘনায় ধরা পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ

৫শ' চিংড়ি ঘের রক্ষায় ভোলার রাজাপুরে রিং বাঁধ হচ্ছে

Bumper yield of potato brings prosperity

হোগলার দড়ি বুনছে ৩ হাজার পরিবার

Extensive Boro farming plan taken up in Barisal region

সম্ভাবনা ও সুযোগ

দ্বীপাঞ্চল, জলাভূমি/ নদী ও মোহনা, নদী ও সামুদ্রিক মাছ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, উন্মুক্ত জলাশয় নিয়ে ভোলা অপার সম্ভাবনাময় জেলা। জেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হল।

কৃষি ও অর্থনীতি

কৃষি ও অর্থনীতি
- দ্বীপাঞ্চল
- জলাভূমি/ নদী ও মোহনা
- কৃষি
- নারিকেল চাষ
- গো-চারণ ভূমি
- নদী ও সামুদ্রিক মাছ
- শুঁটকি মাছ
- চিংড়ি চাষ
- লবণ চাষ
- বাঁধ সংরক্ষণ
- ভূমি ব্যবহার
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী
- রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা

প্রাকৃতিক সম্পদ
- শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র
- উন্মুক্ত জলাশয়
- ম্যানগ্রোভ বন

যোগাযোগ
- নৌ ও স্থল যোগাযোগ

পর্যটন
- দ্বীপাঞ্চল
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

দ্বীপাঞ্চল : অবস্থান, আয়তন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের জীবন ও জীবিকার ধরন বৈচিত্র্য ইত্যাদির বিবেচনায় দ্বীপাঞ্চল অপার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এমন সবুজ, শ্যামল প্রকৃতি, সাগর উপকূল আর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা একমাত্র ভোলা দ্বীপ ছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের আর কোথাও দেখা যায় না। উপকূলীয় বনাঞ্চল, চর এলাকার খাস জমি, গো-চারণ ভূমি, উন্মুক্ত জলাশয়, কৃষি জমি আর বসতি জমির উপস্থিতিতে ভোলার কৃষি ও অর্থনীতিতে রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা।

নদী ও মোহনা : জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নদী ও মোহনার গুরুত্ব অপরিসীম। নদী, খাল খনন, সংস্কার ও ড্রেজিং-এর মাধ্যমে স্বাভাবিক ধারা নিশ্চিত করা জরুরি। এতে মাছ আহরণ থেকে শুরু করে নৌপরিবহনে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে।

জলাশয় : জেলার জলাশয়গুলো সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে মজে যাওয়া ও পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কার করে মাছের প্রজনন খামারে পরিণত করতে পারলে, স্বল্প মূল্যে মাছের পোনা কেনা সহজ হবে।

কৃষি : জেলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে কৃষকদের কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ, বীজ, সার সরবরাহ, কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ দ্বীপাঞ্চলে ও জেলার প্রত্যন্ত জনপদের জলাবদ্ধতা দূর করতে পারলে এক ফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

নারিকেল চাষ : সাম্প্রতিক সময়ে ভোলার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নারিকেল চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জেলার সাতটি উপজেলাতেই নারিকেল চাষের ব্যাপকতা চোখে পড়ে। ভোলা জেলার মাটির গুণাগুণ ও লবণের পরিমাণ নারিকেল চাষের উপযোগী হওয়ায় প্রতিটি উপজেলার গৃহস্থালি, রাস্তার দুই ধার এবং তীরে নারিকেল চারা লাগানো শুরু হয়েছে। নারিকেল গাছের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপজেলাগুলোর পর্যটন সম্ভাবনাতে বিশেষ মাত্রা যোগ করছে। সম্প্রতি বন বিভাগ "উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রোগ্রাম" এর আওতায় ৫০,০০০ নারিকেল চারা বিতরণ করছে। এই প্রকল্প দ্বীপাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে মোট ৩ লাখ নারিকেল চারা বিতরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং এই চারাগুলো জেলার ৭টি উপজেলার নার্সারী

থেকে সরবরাহ করা হবে। উল্লেখ্য, ভোলা জেলা ও দেশের অন্যত্র নারিকেল ও ডাবের চাহিদা মেটাতে এই কর্মসূচি ব্যাপক প্রভাব রাখবে বলে আশা করা যায়।

নদী ও সামুদ্রিক মাছ : যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে নদী ও সমুদ্রের মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ) ঋণের মাধ্যমে জেলেদের দিতে হবে। যার ফলে নদী ও সাগর পাড়ের জেলেরা গভীর সাগরের অফুরান মাছ ধরতে পারবে, অগভীর সাগরের উপর চাপ কমবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে গভীর সাগরের মাছ উৎপাদন বাড়বে। শুধু তাই নয়, সচেতনতা সৃষ্টিতে জেলেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া সাগরের উপরের ও গভীর স্তরের মাছ এবং অপ্রচলিত মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় যথাযথ উপায়ে এসব মাছ আহরণ, প্রজাতি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ছাড়া মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও হিমাগার স্থাপনের উদ্যোগ ও বিনিয়োগ জেলায় মৎস্য শিল্পকে বিকশিত করবে।

মৎস্য অভয়ারণ্য : ভোলা জেলায় উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে (মৎস্য বিভাগ, ২০০৩)। এটি বাস্তবায়িত হলে বিরল প্রজাতির মাছ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

চিংড়ি চাষ : আধা নিবিড় ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। জমির যথাযথ ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ জেলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। হ্যাচারি ও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে অনেক মৎস্য চাষীই চিংড়ি চাষে উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

শুঁটকি মাছ : ভোলা জেলার আরেকটি অন্যতম সম্ভাবনা হল শুঁটকি মাছ। স্বল্প দামের "সোলার টানেল ড্রায়ার" পদ্ধতিতে পুষ্টি ও গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করা সম্ভব। যথাযথ আর্থিক, প্রযুক্তিগত সাহায্য ও শুঁটকি তৈরির প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

লবণ চাষ : উপযুক্ত প্রযুক্তি ও কৌশল, অর্থ সাহায্য, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলার বিলীন হয়ে যাওয়া শিল্প লবণ চাষের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তবে এর সাথে লবণ বিশুদ্ধকরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

বাঁধ সংরক্ষণ : বাঁধ সংরক্ষণে বাস্তব, সময়োচিত উদ্যোগ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

ব্যক্তিখাত : জেলার ব্যক্তিখাতকে উদ্দীপ্ত করা প্রয়োজন। জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভূমি ব্যবহার : স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরি করা গেলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

শিল্পাঞ্চল : ৭টি উপজেলায় ৭টি শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে, একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে। এই সকল শিল্পাঞ্চলে স্ব স্ব উপজেলার প্রবাসী ঋণ বিনিয়োগ করবেন। সরকার

সবধরনের অবকাঠামোর এবং আইনগত সিদ্ধান্ত সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। ব্যক্তিখাতও সার্বিক সহযোগিতা দেবেন।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী : দ্বীপাঞ্চলের বেড়িবাঁধ বা উপকূলীয় বেষ্টনীতে যে উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি চালু আছে, তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকি জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য আনতে সক্ষম।

প্রাকৃতিক সম্পদ

ভোলা জেলা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশাল সম্পদের একটি উপযুক্ত সমীক্ষা হওয়া দরকার। প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা গেলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দুয়ার খুলে যাবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে এটি করা যেতে পারে।

শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র : সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, বর্তমান সরকার শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে একটি "পাওয়ার প্লান্ট" প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ভোলা জেলায় গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সহায়তায় ড্রিলিং ও গ্যাস উত্তোলন কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে জেলার খনিজ সম্পদের মোট পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার। উপযুক্ত উপায়ে এসব খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে পারলে দেশের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহজ হবে।

উন্মুক্ত জলাশয় : ভোলার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হল উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরা, হাজার হাজার মানুষের জীবিকা উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উপর নির্ভরশীল। জনসচেতনতা সৃষ্টি, সীমিত মাত্রার মাছ আহরণ, মাছের প্রজনন নিশ্চিত করতে পারলে এসব উন্মুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই জলাশয় থেকে অর্থনৈতিক লাভ অর্জন করা সম্ভব।

ম্যানগ্রোভ বন : বনজ সম্পদ রক্ষার যথাযথ উদ্যোগের পাশাপাশি আজ যেটুকু ম্যানগ্রোভ অবশিষ্ট আছে সেটুকু বন রক্ষা করতে পারলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও সাগরের উৎপাদন বাড়বে। দ্বীপাঞ্চলে ভাঙন ও প্লাবন হ্রাস পাবে।

যোগাযোগ

নৌ ও স্থল যোগাযোগ : জেলার রাস্তাঘাটে উন্নয়ন ও নৌপরিবহনে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা গেলে ভোলাবাসীর গতিশীলতা বাড়বে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটবে।

বন্দর স্থাপন : নৌ ও স্থলবন্দর স্থাপনের মাধ্যমে ভোলার বাণিজ্যি সম্ভাবনাকে এগিয়ে নেয়া যায়।

পর্যটন

দ্বীপাঞ্চল : ভোলার দ্বীপাঞ্চলের নৈসর্গিক শোভা, বেলাভূমি, জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র্য - সর্বোপরি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে এবং প্রকৃতিকে উপভোগ করেই এই ইকো-ট্যুরিজম, দ্বীপ-ট্যুরিজম বা নৌবিহার হতে পারে।

উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা : ভোলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্প বিকাশের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা হল ভোলার দ্বীপাঞ্চল। দ্বীপগুলোতে পৌঁছাতে যোগাযোগ

ব্যবস্থা সহজ করতে হবে এবং উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে দ্বীপাঞ্চলে পর্যটন শিল্প আরো বিকশিত হবে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ পর্যটনের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ : জেলার বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোগ একদিকে যেমন দেশের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করবে, তেমনি অন্যদিকে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীদের প্রজাতি রক্ষা সম্ভব হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : জেলাটিতে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখা যায়। যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে এই স্থানগুলো একেকটি পর্যটন স্থানে পরিণত হতে পারে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

ভোলা জেলা বর্তমান জনসংখ্যা ১৭.৩ লাখ থেকে আগামী ২০১৫ সালে হবে ২০.৪৮ লাখ এবং ২০৫০ সালে ২৮.৬৫ লাখ। জেলার জনসংখ্যার ৫২% পুরুষ এবং ৪৮% নারী আর ৮৫% গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ১৫% শহুরে জনগোষ্ঠী।২০১৫ সাল, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। মাত্র ১৫ বছরে লোক সংখ্যা বাড়বে ৩.৪৫ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়; তা হল - দ্বীপাঞ্চল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, খনিজ সম্পদের উপস্থিতি এবং পর্যটন সম্ভাবনা ইত্যাদি।

অন্যদিকে যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার তা হল - অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পয়:সুবিধা, স্বাস্থ্য কাঠামো, প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাট বাজারের উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা, নদী ভাঙন প্রতিরোধ ইত্যাদি।

ভোলা জেলা ভূমি বন্দোবস্তের সমস্যা রোধে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসন, স্থানীয় এমপি, স্থানীয় কলেজের একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক, স্থানীয় চেয়ারম্যান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সার্বিক তদন্ত ও ভূমি বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত জমি বন্দোবস্ত দেয়ার কাজ সম্পাদন করা যাবে। জমি বন্দোবস্তের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরকারি আমিনের মাধ্যমে সরেজমিনে নথির মালিককে জমি বুঝিয়ে সহজ হবে। খাস জমি বন্দোবস্তেরযোগ্য কোন ব্যক্তির দখলে খাস জমি থাকলে অন্য কাউকে সেটির একসনা ডিসিআর প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা ও মাঠে জমির পরিমাণ অনুযায়ী সঠিক নক্শা প্রণয়ন ও সেই সাথে জমি চাষের মৌসুমে ও ফসল কাটার সময় পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করলে ভূমি বন্দোবস্তের জটিলতা হ্রাস পারে।

এ ছাড়া জেলার ৭টি উপজেলায় ৭টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। রাস্তাঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এ সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করেই উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীরা একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে অন্যদিকে প্রবাসে থাকার কারণে রফতানিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বস্তুত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ ভোলার অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

ভোলা জেলা প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে পরিকল্পিত "পাওয়ার প্লান্ট" প্রতিষ্ঠা করা হলে ভোলা জেলায় গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে দেশের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহজ হবে।

ভোলায় পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে ইকো-ট্যুরিজম, দ্বীপ-ট্যুরিজম বা নৌবিহার বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ঠিক রেখে বন্যপ্রাণী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অবকাশযাপন কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে ভোলার অর্থনীতি জোরদার হবে।

কৃষিপণ্য ও মাছ ভোলা জেলার প্রধান বাণিজ্য উৎপাদন। মেঘনায় জাটকা নিধন, কারেন্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার ও নদী দূষণ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি কৃষকদের কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ, কৃষি প্রশিক্ষণ, সমন্বিত ধান মাছ চাষ পদ্ধতির প্রসার, নারী-পুরুষদের IPM পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, কৃষিপন্য বাজারজাত ও গুদামজাতকরণ নিশ্চিত করা সহ চরাঞ্চলে ও জেলার প্রত্যন্ত জনপদের জলাবদ্ধতা দূর করে এক ফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জেলার কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

দর্শনীয় স্থান

দ্বীপাঞ্চল

চর মনপুরা : অর্ধচন্দ্রাকৃতির মনপুরা দ্বীপের পশ্চিম ধারে দাঁড়িয়ে মেঘনার বুকে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সবুজ শ্যামল, ছায়াঘন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই দ্বীপটিকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। বিগত এক দশক আগে চর মনপুরায় বনায়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়, যা থেকে এটি একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানে পরিণত হয়। এখানে প্রতিবছর ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণ প্রসাদ মেলা বসে।

চর কুকড়ি মুকড়ি : অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী চর কুকড়ি মুকড়ির অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মত। এখানে সহজেই পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান

দেউলী : বোরহানউদ্দীন উপজেলার একটি সুপ্রাচীন জনপদ হল দেউলী। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, এই জনপদে একসময় রাজা জয়দেবের ছোট মেয়ে বিদ্যাসুন্দরী ও তার স্বামী বসবাস করত। দেউলীর গুরিন্দাবাড়িতে এরই সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাচীন ভবন। এ ছাড়াও দেউলিতে বিদ্যাসুন্দরী নামে একটি দীঘি রয়েছে, যার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।

মির্জাকালু : তজুমদ্দীন উপজেলায় অবস্থিত ভোলার বিখ্যাত একটি বন্দর। ব্রিটিশ আমলে মির্জাকালু স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। ১৯২৩ সালে এখানে লবণ বিদ্রোহ হয়। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন কৃষক প্রাণ হারায়।

দৌলতখান : ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ ভোলার দৌলতখান উপজেলা। একসময় এই দৌলতখানে কালা রায়ের জমিদারী ছিল। সেই জমিদারীর নিদর্শনস্বরূপ এখানে কালা রায়ের নির্মাণ করা ভবনটি এখনো আছে। তবে এর অবস্থা জরাজীর্ণ। এ ছাড়া সেই জমিদারী আমলের একটি মন্দির ও দীঘি এখনো বর্তমান।

বোরহানউদ্দীন : ভোলা জেলার অতি প্রাচীন স্থলভাগ, যা কিনা একসময় চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের অধীনে ছিল। সুলতানী আমলে এই স্থানে একযোগে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজ কর্মচারীদের বসতি গড়ে ওঠে। এখানকার বোরহানউদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়টি অত্যন্ত পুরনো, ১৯১৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এককালের জননন্দিত ভূস্বামী বোরহানউদ্দীন হাওলাদারের নামে এর নামকরণ করা হয়।

গঙ্গাপুর : বোরহানউদ্দীন উপজেলার একটি গ্রাম গঙ্গাপুর। এটি প্রখ্যাত কয়জন ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান। এই এলাকার নামকরণের সাথে স্থানীয় জমিদার পরিবারের বা সিকদার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কথিত আছে, হিজলা থানার গঙ্গাপুর থেকে জনৈক আব্দুল মান্নান সিকদার এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং এলাকাটির নামকরণ করেন গঙ্গাপুর। তিনি এখানে জমিদারী পত্তন করেন। এই পরিবারের তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী পর্যায়ক্রমে প্রজাপাটি, বঙ্গীয় আইনসভা ও পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই এলাকারই আরেকজন নূর আহমেদ সিকদার কংগ্রেস নেতা ও সুসাহিত্যিক ছিলেন।

জয়নগর : এটি ভোলা জেলার একটি বৃহত্তম গ্রাম। বেতুয়া নদীর চরে এই জয়নগর গ্রাম অবস্থিত। জয়নগর উর্বর মাটি, ফসল, গৃহস্থালির বাগান, নারিকেল আর সুপারি বাগানের জন্য বিখ্যাত। গ্রামের পাশ দিয়ে ভোলা থেকে লালমোহন পর্যন্ত জেলা বোর্ডের রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তার সমান্তরালে একটি জোয়ার-ভাটার খালও বহমান। সত্তর দশকে সরকার এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা এবং চারটি সংরক্ষিত ট্যাংক ও কূপ খনন করা হয়।

কুতবা : বোরহানউদ্দীন উপজেলার এই স্থানটি নানা কারণে বিখ্যাত। এটি একযোগে খেলাফত, স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। এ ছাড়া এখানকার কুতবা চৌধুরী পরিবার দীর্ঘ সময় ধরে এলাকায় জমিদারী চালান।

তজুমদ্দীন : ১৯২৮ সালে তজুমদ্দীন উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জমিদার নায়েব তজুমদ্দীনের নামে এই উপজেলার নামকরণ করা হয়। এটি মেঘনার ভাঙ্গনের শিকার একটি দুর্যোগকবলিত জনপদ। তজুমদ্দীনের ভুবন ঠাকুর মেলা জননন্দিত একটি মেলা ।

লালমোহন : এই এলাকা বড় বড় মহিষ, বাঘ ও হরিণের জন্য বিখ্যাত ছিল। তহশীলদার লালমোহন কুন্ডের নামে এই এলাকার নামকরণ করা হয়।

মনপুরা ফিশারীজ লিমিটেড : এই স্থানীয় ফার্ম-হাউজ ও পর্যটন অবকাশযাপন কেন্দ্রটির চিত্রা হরিণ, ডেইরী ফার্ম, পুকুর, বাগান ও নারিকেল গাছের সারিসহ সব ধরনের আধুনিক সুবিধা ভোলার অন্যতম প্রধান একটি পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করেছে।